ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৫তম বর্ষ ২য় সংখ্যা

নভেম্বর ২০১১

মাসিক
আত-তাহরীক

১৫তম বর্ষ : ২য় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

(১) পুঁজিবাদের চূড়ায় ধ্বস

Occupy Wall Street বা 'ওয়াল স্ট্রীট দখল করো' শ্লোগান দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু শিক্ষার্থী ও সদ্য পাস করা বেকার যুবক গত ১৭ই সেপ্টেম্বর '১১ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক রাজধানী নিউইয়র্কের রাস্তায় যে আন্দোলন শুরু করেছিল, তা মাত্র এক মাসের ব্যবধানে গত ১৫ই অক্টোবর বিশ্বের ৮২টি দেশের ৯৫১টি শহরে বিক্ষোভ আকারে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে লণ্ডনের ধনীরা এখন দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা করছে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, জাপান সর্বত্র হাযার হাযার মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে। তাদের একটাই ক্ষোভ ৯৯ শতাংশ মানুষের রূযী মাত্র ১ শতাংশ মানুষ ভোগ করছে। মুনাফালোভী ব্যাংকার ও ধনী রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবী যেন একসাথে ফুঁসে উঠেছে। বিশ্ব পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এটি এখন টাইম বোমায় রূপ নিয়েছে।

এটা কি একদিনে হয়েছে? এটা কি কোন সাময়িক ইস্যু? না, বরং এটি শত বছরের ধূমায়িত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী ও বিশ্বজনীন ইস্যু। যেখানেই পুঁজিবাদ, সেখানেই এ ক্ষোভ অবশ্যই থাকবে। পুঁজিবাদী ধনিক শ্রেণী বিভিন্ন নিয়ম-কানূন তৈরী করে দু'হাতে অপরের ধন লুট করছে। আর একে আইনসম্মত ও নিরাপদ করার জন্য তাদের অর্থে ও তাদের স্বার্থে গড়ে উঠেছে দেশে দেশে বিভিন্ন নামে শোষণবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমূহ। মানুষ কেবল ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু এ থেকে মুক্তির পথ তারা জানে না। তাই দেখা যায় নানা মুণির নানা মত। হাঁ মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এ থেকে মুক্তির পথ বাৎলে দিয়েছেন। যেটি হ'ল ছিরাতে মুস্তাক্বীম বা সরল পথ। মানুষকে অবশ্যই সে পথে ফিরে যেতে হবে, যদি তারা শান্তি চায়। আসুন একবার ফিরে তাকাই সেদিকে।

ভোগ ও ত্যাগ দু'টিই মানুষের স্বভাবসিদ্ধ বিষয়। দু'টির সুষ্ঠু সমন্বয়ে মানুষের জীবন শান্তিময় হয়। কিন্তু কোন একটিকে বেছে নিলে জীবন হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ব্যক্তির সীমাহীন ভোগবাদিতা ও লাগামহীন ধনলিপ্সাকে নিরংকুশ করা ও সম্পদ এক হাতে কুক্ষিগত করাই হ'ল পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূলকথা। এর বিপরীতে ব্যক্তিকে মালিকানাহীন ও সম্পদহীন করে আয়-উপাদানের সকল উৎস সমাজ বা রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়াই হ'ল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূলকথা। বুঝাই যাচ্ছে যে, দু'টিই মানুষের স্বভাব বিরোধী ও চরমপন্থী মতবাদ এবং কোনটিই সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের কল্যাণবহ নয়। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। পুঁজিবাদী বিশ্বের মানুষ যেমন ফুঁসে উঠেছে, কম্যুনিষ্ট চীনের লৌহশৃংখলে আবদ্ধ মানুষ তেমনি কোন পথ না পেয়ে এখন আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। ফলে আত্মহত্যা প্রবণ দেশসমূহের তালিকায় চীন পৃথিবীতে শীর্ষে অবস্থান করছে। অন্যদিকে সমাজবাদী রাশিয়ায় ভিক্ষুকের সংখ্যা দুনিয়ায় সবচাইতে বেশী।

উপরোক্ত দুই চরমপন্থী অর্থনীতির বাইরে সুষম অর্থনীতি এই যে, মানুষ তার মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী সম্পদ উপার্জন করবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত বণ্টন করবে। এর ফলে সমাজে অর্থের প্রবাহ সৃষ্টি হবে। ধনী ও গরীবের বৈষম্য হ্রাস পাবে। প্রতিটি পরিবার সচ্ছল হবে। সমাজে কোন বেকার ও বিত্তহীন থাকবে না। সর্বত্র সুখ ও শান্তি বিরাজ করবে। এই আয় ও ব্যয়ের নীতিমালা মানুষ নিজে তৈরী করবে না। বরং আল্লাহ

প্রেরিত অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় বিধান সমূহ সে মেনে চলবে। আল্লাহ্র বিধান সকল মানুষের জন্য সমান। তাই তা অনুসরণে সমাজে সৃষ্টি হবে বৈষম্যহীন ও সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সত্যিকার অর্থে একটি মানবিক অর্থ ব্যবস্থা। যেখানে ধনী তার বিপদগ্রস্ত ভাইয়ের জন্য নিঃস্বার্থভাবে অর্থ ব্যয় করবে। গরীব তার ধনী উপকারী ভাইয়ের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত থাকবে। সকলে হবে সকলের তরে। কেউ হবেনা কেবল নিজের তরে। এই অর্থনীতিই হ'ল ইসলামী অর্থনীতি। যা যথাযথভাবে অনুসরণের ফলে সূদী শোষণে জর্জরিত আরবীয় সমাজ খেলাফতে রাশেদাহ্র প্রথম দশ বছরের মধ্যেই এমনভাবে দারিদ্র্যমুক্ত হয় যে, যাকাত নেওয়ার মত কোন লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। আজও তা সম্ভব, যদি না মুসলিম রাষ্ট্রগুলি তা সঠিকভাবে বাস্তবায়নে আন্তরিক হয়।

রূযী হালাল না হলে ইবাদত কবুল হয় না। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অর্থব্যবস্থার সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। সেকারণ পুঁজিবাদ কেবল অর্থনীতির নাম নয়, বরং একটি সমাজ ব্যবস্থার নাম। একই অবস্থা সমাজতন্ত্রের। উভয় সমাজ ব্যবস্থা স্ব স্ব আক্বীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী পরিচালিত। ঐ দুই সমাজ ব্যবস্থায় মুনাফালোভী ব্যাংকার, মওজুদদার ব্যবসায়ী ও সূদী মহাজনদের প্রধান সহযোগী হ'ল শোষণবাদী ও ক্ষমতালোভী রাজনীতিকরা। এরা তাদের বশংবদ একদল বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে তোলে। যারা বিভিন্ন চটকদার মতবাদ তৈরী ও প্রচার করে সাধারণ মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুৎ করে। তারা তাদের সৃষ্ট ও পরিচালিত ব্যাংক-বীমা-ইনস্যুরেন্স ও নানাবিধ উপায়ে ব্যক্তিগতভাবে ও সমিতি করে কর্পোরেট বাণিজ্যের মাধ্যমে সমাজকে শোষণ করে এবং যাবতীয় আর্থিক উপায়-উপাদানকে নিজেদের করায়ত্ত করে। বর্তমানে বিশ্বায়নের ধুয়া তুলে তারা বিশ্ব শাসন ও শোষণে নেমেছে এবং একে একে বিভিন্ন দেশে তারা হামলা ও লুট করছে। এতে এক শতাংশ লোক সম্পদের পাহাড় গড়ছে। বাকীদের নাভিশ্বাস উঠছে। আজ তারই ফলশ্রুতিতে আমেরিকায় প্রতি ৬ জনে ১ জন ও ভারতে শতকরা ৭৭ জন দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছে। ইংল্যাণ্ডে শতকরা মাত্র ৫ জন ব্যতীত বাকী সবাই অসুখী জীবন যাপন করছে। অথচ এইসব দেশেই বাস করে বিশ্বের সেরা ধনী ব্যক্তিরা।

আজ থেকে অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বে পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদ কোলিন ক্লার্ক বলেছিলেন, বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে সর্বাপেক্ষা কম ও সর্বাপেক্ষা বেশী আয়ের শতকরা অনুপাত হ'ল গড়ে ১ : ২০ লক্ষ। এই আকাশ ছোঁয়া অর্থনৈতিক বৈষম্যের মধ্যে মানুষ কিভাবে বসবাস করে, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে বহু রক্তের বিনিময়ে রাশিয়া ও চীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তথাকথিত শোষণহীন সমাজবাদী অর্থনীতি। কিন্তু মাত্র কিছু দিনের মধ্যেই এর তিক্ত ফল সেদেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে। একদিকে তারা মানুষের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করে, অন্যদিকে তাদেরকে আয়-রোজগারহীন করে কার্যত: কারাবন্দীর অবস্থায় নিয়ে ফেলে। এর পরিণতিতে তাদের অর্থনৈতিক বৈষম্যের হার দাঁড়ায় অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বের রাশিয়ার সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী ১ : ৩ লক্ষ। তাই বর্তমানে পুনরায় পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যে বিশ্বজাগরণ দেখা যাচ্ছে, তা যদি ইসলামের দিকে ফিরে না এসে অন্যদিকে মোড় নেয়, তাহ'লে তার পরিণতি আরও ভয়াবহ হবে। তা মানুষকে তার কাংখিত সুখ কখনোই এনে দিতে পারবে না।

পুঁজিবাদী সমাজে বসবাস করে পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই মুসলিম রাষ্ট্রগুলি এ ব্যাপারে আন্তরিক হ'লে তারাই বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ামক হ'তে পারত। কিন্তু তাদের মধ্যে ছালাত-ছিয়াম-হজ্জ প্রভৃতি বিষয়ে যত না আগ্রহ আছে, নিজেদের রূযী হালাল করার ও দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করার ব্যাপারে সে তুলনায় বিন্দুমাত্র আন্তরিকতা নেই। বরং এ বিষয়ে তারা পুঁজিবাদী বিশ্বের শতভাগ অনুসারী। ফলে সারা জীবন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পাশ্চাত্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হচ্ছে। উন্নতির কোন লক্ষণ নেই।

ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদের প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ। মানুষ হ'ল তার যামিনদার। তাই মানুষ তার ইচ্ছামত আয় ও ব্যয় করতে পারে না। এ অর্থনীতিতে হালাল ও হারামের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং রয়েছে আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক ধন বণ্টনের নীতিমালা। এ অর্থনীতি মানুষকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আনন্দের বিপরীতে আখেরাতের চিরস্থায়ী শান্তির প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এ অর্থনীতি মানুষকে মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল বানায়। ফলে এ সমাজে কোন আর্থিক হানাহানি বা বাণিজ্য যুদ্ধ কিংবা কোনরূপ অসুস্থ প্রতিযোগিতা থাকে না। এ সমাজের মানুষ ভোগে নয়, বরং ত্যাগে তৃপ্তি পায়। দেশের শাসক ও ধনিক শ্রেণী কি এ ব্যাপারে আন্তরিক হতে পারেন? যদি না পারেন তাহ'লে ওয়াল স্ট্রীট দখলের ঢেউ এদেশে আছড়ে পড়বে না, তার নিশ্চয়তা কে দিবে? আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!! *[স.স.]*

(২) চলে গেলেন আফ্রিকার সিংহ

সাদ্দাম, বিন লাদেন অতঃপর গাদ্দাফীকে হত্যা করল আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ। ওবামা হুমকি দিলেন পূর্বের ন্যায় এই বলে যে, আবারও প্রমাণিত হ'ল, 'আমেরিকা যা চায় তাই করে'। শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ব্যক্তির এই দম্ভোক্তি আল্লাহ শুনেছেন ও দেখেছেন। নিশ্চয়ই আসমানী ফায়ছালা নেমে আসবে এ যুগের ফেরাঊনদের বিরুদ্ধে। তবে চলুন আমরা অতীত নিয়ে কিছু কথা বলি। (১) ১৯৬৭ সালের জুনে ইংল্যাণ্ডে সামরিক প্রশিক্ষণরত তরুণ ক্যাডেট মু'আম্মার আল-ক্বাযযাফী (গাদ্দাফী) তার তিনজন সাথীকে নিয়ে লণ্ডনের লেসাম্বাডর রেস্টুরেন্টের জুয়ার আড্ডায় দেখতে পান তার দেশের বাদশাহ ইদ্রীসের তৈল উপদেষ্টাকে এক ঘণ্টার মধ্যে দেড় লাখ পাউণ্ড হারতে। আর তাকে অর্থের যোগান দিচ্ছে পাশে বসা গ্রীক জাহায কোম্পানীর এক মালিক। যিনি লিবিয়া থেকে তৈল নিয়ে তার জাহাযে করে ইউরোপে পৌঁছে দিয়ে কোটি কোটি পাউণ্ড শুষে নেন (২) ১৯৬৯ সালে তার নিজ জন্মস্থান সিরত বন্দর থেকে পাইপ লাইন বসিয়ে তৈল পরিবহনের শুরুতে বিদেশী অক্সিডেন্টাল কোম্পানীর আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বয়োবৃদ্ধ বাদশাহকে গার্ড অব অনার দেওয়ার অনুষ্ঠানে তিনি দেখতে পান দেশের মন্ত্রী ও সরকারী লোকদের চরম বিলাসিতা ও বিদেশী তোয়াজের মহড়া। অথচ তখন ত্রিপোলীর রাস্তায় চলত ছিন্ন পোষাক পরিহিত নগ্নপদ হাযার হাযার মানুষ। যখন ছিল না কোন উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা, ছিল না যথেষ্টসংখ্যক হাসপাতাল। অথচ মন্ত্রীরা ঘন ঘন বিদেশে গিয়ে জুয়ার আসর মাত করত, আর দেশের টাকা লুট করে সুইস ব্যাংকে জমা করত (৩) ১লা সেপ্টেম্বর '৬৯ বাদশাহ ইদ্রীস তখন রাষ্ট্রীয় সফরে তুরস্কে। সুযোগ নিলেন গাদ্দাফী। কয়েকজন তরুণ সৈনিক বন্ধু মিলে এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলেন। তখন তার বয়স মাত্র ২৭। ক্ষমতায় বসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই

তিনি আটক করলেন বাদশাহর সেই জুয়াড়ী তৈল উপদেষ্টাকে এবং অন্যান্য লুটেরা মন্ত্রী ও আমলাকে। (৪) কয়েকদিন পরে রাতের বেলায় ছদ্মবেশে ঢুকলেন রাজধানী ত্রিপোলীর এক নামকরা নৈশ ক্লাবে। মদে চুর নর্তকী ও তাদের ভোগকারীদের মাঝে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ছদ্মবেশ ফেলে বাঁশিতে ফুঁক দিলেন গাদ্দাফী। সাথে সাথে অপেক্ষারত সৈনিকেরা এসে দেড়শ' নারী-পুরুষকে বন্দী করে নিয়ে গেল। ঐদিনের পর থেকে রাজধানীর সকল মদ্যশালা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল যা গত ৪২ বছরে আর কখনো খোলা হয়নি (৫) কয়দিন পরে ছদ্মবেশে গেলেন এক হাসপাতালে। কোন ডাক্তার নেই। তার বারবার কাকুতি-মিনতিতে দয়াপরবশ হয়ে অবশেষে গল্পরত জনৈক নার্স বলল, তুমি কাল এসো'। ক্ষুব্ধ ব্যাঘ্র হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন, আমি কালকে যখন আসব, তখন তোমরা কেউ আর এখানে থাকবে না, থাকবে জেলে'।

লিবীয় বিপ্লবের এই তরুণ ব্যাঘ্রের দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের কথা বিদ্যুদ্বেগে ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। মযলূম মানবতা তাকে ত্রাণকর্তা হিসাবে বরণ করে নিল। অফিস-আদালত ঘুষমুক্ত হ'ল, দেশ থেকে মদ দূর হ'ল, দুর্নীতি উঠে গেল। এবারে নযর দিলেন বিদেশী আমেরিকান ও বৃটিশদের দিকে। প্রথমে তিনি আমেরিকার 'হুইলাস' বিমান ঘাঁটি গুটিয়ে নেবার নির্দেশ জারি করলেন। রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে রইল সারা আরব জাহান। কিন্তু না। সে নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত হ'ল। এরপর বৃটিশদের পালা। নির্দেশ পেয়ে তারাও বেনগাজীর সামরিক ঘাঁটি ছেড়ে গেল। এবারে পশ্চিমা প্রভাব দূরীকরণের দিকে মন দিলেন। সিনেমা-টিভিতে নগ্ন ছবি প্রদর্শন ও রাস্তায় নগ্ন মেয়েদের চলাফেরা বন্ধ হয়ে গেল। লিবিয়াকে তার নিজস্ব ইসলামী সংস্কৃতি অনুযায়ী গড়ে তোলার দৃঢ় পদক্ষেপ শুরু হয়ে গেল সর্বত্র। মনোযোগ দিলেন দেশের অর্থনীতির দিকে। আল্লাহ্র দেওয়া নে'মত ভূগর্ভের তৈলভাণ্ডার যা এতদিন বিদেশীরা নামমাত্র মূল্যে লুট করছিল, তিনি তার মূল্য বাড়িয়ে দিলেন। ফলে দ্রুত লিবিয়ার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। ফলে গাদ্দাফী শাসনের প্রথমার্ধেই লিবিয়া পৃথিবীর অন্যতম ধনী দেশে পরিণত হ'ল।

(১) ইতিপূর্বে লিবিয়ার সাধারণ মানুষের কোন ঘর-বাড়ি ছিল না। তারা তাঁবুতে যাযাবর জীবন যাপন করত। গাদ্দাফী নিজেও সেভাবে থাকতেন। তেলের টাকা হাতে পেয়ে এবার তিনি লিবীয়দের জন্য গৃহনির্মাণ শুরু করলেন। একসময় তার পিতা তাকে নিজের জন্য একটি বাড়ী নির্মাণ করতে বললে তিনি বলেন, একজন লিবীয়র গৃহনির্মাণ বাকী থাকতে আপনার ছেলে নিজের জন্য কোন বাড়ী বানাবে না (২) দেশে শিক্ষিতের হার ২৫ শতাংশ থেকে তিনি ৮৩ শতাংশে উন্নীত করেন (৩) তৈল ভাণ্ডার হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় শহরগুলির বাইরে লিবীয়রা যেখানে বিদ্যুতের দেখা পেত না, সেখানে সর্বত্র ফ্রি বিদ্যুতের আলো ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং লিবীয় নাগরিকদের ভাষ্যমতে গত ৪২ বছরে কখনো বিদ্যুৎ চলে গেছে বলে তাদের জানা নেই (৪) তৈল বিক্রির টাকা ব্যাংকে জমা হ'লেই তার একটা অংশ প্রত্যেক লিবীয় নাগরিকের ব্যাংক একাউন্টে চলে যেত (৫) বিবাহ উপলক্ষে নবদম্পতির জন্য এককালীন ৫০ হাযার ডলার এবং সন্তান হ'লে ৫০০০ ডলার পাঠিয়ে দিতেন (৬) চিকিৎসা বা পড়াশুনার জন্য বিদেশ গেলে মাসিক ২৩০০ ডলার (৭) কোন কারণে কেউ বেকার হয়ে পড়লে তার একাউন্টে চলে যেত নির্দিষ্ট হারে বেকার ভাতা (৮) কেউ ব্যবসা করতে চাইলে বিনা সূদে ব্যাংক ঋণ দেওয়া হত এবং (৯) গাড়ি কিনতে চাইলে গাড়ির মূল্যের অর্ধেক সরকার বহন করত (১০) এতদ্ব্যতীত লিবীয় নাগরিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান বাবদ যাবতীয় খরচ সরকার বহন করত (১১) কৃষকদের জমি, বীজ, খামারবাড়ী ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি বিনামূল্যে দেওয়া হ'ত (১২) ১৯৮৩ হ'তে ৯০ সালের মধ্যে কোনরূপ বিদেশী ঋণ ছাড়াই ২৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মিত সারা লিবিয়া ব্যাপী ২৮৪০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ ভূগর্ভস্থ পানির পাইপ লাইন ছিল বিশ্বের ৮ম আশ্চর্য। যা আজও লিবিয়াবাসীকে দৈনিক ৬৫ হাযার ঘন লিটার বিশুদ্ধ পানি নিয়মিতভাবে পৌঁছে দিচ্ছে। যাকে বলা হয় বিশ্বের বৃহত্তম মনুষ্য নির্মিত ভূগর্ভ নদী। এভাবে লিবীয় নাগরিকরা গাদ্দাফীযুগে বেদুঈন জীবন থেকে উত্তরণ করে রাজার হালে বাস করত (১৩) তার সময়ে তার দেশের কোন বৈদেশিক ঋণ তো ছিলই না। বরং তাঁর মৃত্যুকালে লিবিয়ার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ১৫০ বিলিয়ন ডলার।

অনেকেই তাকে স্বৈরাচারী বলে সস্তা গালি দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁরা বুঝেন না যে, যিনি শূন্য থেকে দেশটিকে তুঙ্গে এনেছেন, তিনি কিভাবে তার জীবদ্দশায় তাকে আবার শূন্যে নিক্ষেপ করবেন? লিবীয় বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য এখানে এই যে, (১) বিপ্লবের সাথী অনেককে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োগ করার পর তাদের দুর্নীতি ও বিশ্বাসঘাতকতা তাকে দারুণভাবে ব্যথিত করে (২) পরবর্তী যোগ্য ও দেশপ্রেমিক নেতা তিনি কাউকে পাননি (৩) কঠোর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ বল্গাহীন চরিত্রের কিছু লোককে তার বিরোধী করে তোলে (৪) অবাধ লুটপাটে ব্যর্থ হয়ে আমেরিকা তার গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ-কে দিয়ে সর্বদা একদল লোককে গাদ্দাফীর বিরুদ্ধে তৈরী করতে থাকে। সম্প্রতি উইকিলিক্সের ফাঁস করা তথ্য অনুযায়ী গাদ্দাফী হত্যার পুরা ষড়যন্ত্র সিআইএ-র পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটেছে। যা তারা বহুদিন থেকে করে আসছিল। গাদ্দাফী সেটা বুঝতে পেরেই রাষ্ট্রক্ষমতা ছাড়তে চাননি। ২০০৯ সালে গাদ্দাফী জাতিসংঘে ভাষণ দেবার সময়সীমা ১৫ মিনিটের স্থলে দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। এই সময় তিনি জাতিসংঘ সনদ ছিঁড়ে ফেলেন ও জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে 'সর্ববৃহৎ সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসাবে আখ্যায়িত করেন। এছাড়াও আফ্রিকান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি ঔপনিবেশিক শাসনামলে অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণের অভিযোগে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে ৭ লাখ ৭০ হাযার কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। পাশ্চাত্যের লুটেরা শক্তির বিরুদ্ধে তার এই আপোষহীন দৃঢ়তাই তার জন্য কাল হয়। শুরু থেকেই আমেরিকা তাকে হত্যার চেষ্টা চালাচ্ছিল। ১৯৮৬ সালে ত্রিপোলীতে তার বাড়ীতে বিমান হামলা চালানো হয়। ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান। কিন্তু তাঁর শিশু কন্যা নিহত হয়। অতঃপর গত আগষ্টে তার বাড়ীর উপর কয়েকবার বিমান হামলা করা হয়, যাতে তাঁর পরিবারের অনেকেই নিহত হন। ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে গেলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে জীবন দিতে হয়।

নিহত হওয়ার কিছুদিন আগে তিনি বলেন, আমি দেশ ছেড়ে যাব না। ইহুদী-খৃষ্টান হায়েনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে দেশের মাটিতেই জীবন দেব। আল্লাহ তাঁর এই প্রার্থনা কবুল করেছেন। তিনি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে নিজ জন্মস্থানেই নিজ পুত্র ও সহকর্মীদের সাথে বিদেশী হামলায় মৃত্যুবরণ করেছেন। মানুষ হিসাবে তাঁর অনেক ভুল ছিল। আল্লাহ তাঁর ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন ও তাঁকে জান্নাত নছীব করুন। আমীন! *[স.স.]*

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২৫/১৭ কিস্তি)

২৫. হযরত মুহাম্মাদ
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

ক্বাযা ওমরাহ (عمرة القضاء)

(৭ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ)

হুদায়বিয়া সন্ধির শর্তানুযায়ী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমরাহ করার জন্য প্রস্তুতি নেন। গত বছরে যারা হোদায়বিয়ায় হাযির ছিলেন, তাদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন তারা ছাড়াও অন্যান্যগণ মিলে মোট দু'হাযার ব্যক্তি রাসূলের সঙ্গে বের হন। মহিলা ও শিশুরা ছিল এই সংখ্যার বাইরে।[১] মুশরিকদের চুক্তি ভঙ্গের আশংকায় যুদ্ধে পারদর্শী লোকদের এবং যুদ্ধাস্ত্র সমূহ সঙ্গে নেয়া হয় *(ঐ)*।

আবু রুহম 'ওয়াইফ আল-গেফারী (أبو رهم عويف الغفاري) -কে মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত করে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লেন। সঙ্গে নিলেন কুরবানীর জন্য ৬০টি উট। অতঃপর যুল-হুলায়ফা পৌঁছে ওমরাহ্র জন্য এহরাম বাঁধলেন এবং সকলে উঁচু স্বরে 'লাব্বায়েক' ধ্বনি দেন। মক্কার নিকটবর্তী ইয়াজেজ (يأجج) নামক স্থানে পৌঁছে বর্ম, ঢাল, বর্শা, তীর প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র সমূহ রেখে দেওয়া হ'ল। আওস বিন খাওলী আনছারীর (أوس بن خولى الأنصاري) নেতৃত্বে দু'শো লোককে এগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য সেখানে রাখা হ'ল। বাকীরা মুসাফিরের অস্ত্র ও কোষবদ্ধ তরবারিসহ মক্কায় গমন করেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উষ্ট্রী ক্বাছওয়া (القصواء)-এর পিঠে সওয়ার ছিলেন এবং মুসলমানগণ স্ব স্ব তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে রাসূলকে মাঝে রেখে 'লাব্বায়েক' ধ্বনি দিতে থাকেন। 'হাজুন' মুখী টিলার পথ ধরে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মক্কায় প্রবেশ করেন।

মুশরিকরা সব বেরিয়ে মক্কার উত্তর পার্শ্বে 'কু'আই ক্বা'আন' (القعيقعان) পাহাড়ের উপরে জমা হয়ে মুসলমানদের আগমন দেখতে থাকে এবং বলাবলি করতে থাকে যে, ইয়াছরিবের জ্বর (قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ) এদের দুর্বল করে দিয়েছে'। একথা জানতে পেরে রাসূল (ছাঃ) সবাইকে নির্দেশ দিলেন যেন ত্বাওয়াফের সময় প্রথম তিনটি চক্কর দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করে, যাকে 'রমল' (الرمل) বলা হয়।[২] তবে রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান স্বাভাবিক ভাবে অতিক্রম করবে। এ নির্দেশ তিনি এজন্যে দেন, যাতে মুশরিকেরা মুসলমানদের শক্তি-ক্ষমতা দেখতে পায়। একই উদ্দেশ্যে তিনি তাদের ইযত্বেবার (الاضطباع) নির্দেশ দেন। যার অর্থ হ'ল ডান কাঁধ খোলা রেখে বগলের নীচ দিয়ে চাদর বাম কাঁধের উপরে রাখা। এর মাধ্যমে একজনকে সদা প্রস্তুত ও স্মার্ট দেখা যায়। মুশরিকেরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রাসূলকে দেখতে থাকে। এরি মধ্যে তিনি 'লাব্বায়েক' ধ্বনি দিতে দিতে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন এবং স্বীয় লাঠি দ্বারা হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করেন। অতঃপর ত্বাওয়াফ করেন ও মুসলমানেরাও ত্বাওয়াফ করে। ত্বাওয়াফের সময় আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) যুদ্ধছন্দে (الرجز) পাঁচ লাইনের কবিতা বলতে বলতে রাসূলের আগে আগে চলতে থাকেন। এতে হযরত ওমর (রাঃ) তাকে বলেন, يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفِى حَرَمِ اللهِ تَقُولُ الشِّعْرَ؟ 'হে ইবনে রাওয়াহা! আল্লাহ্র রাসূলের সামনে ও আল্লাহ্র হারামের মধ্যে তুমি কবিতা পাঠ করছ'? তখন রাসূল (ছাঃ) ওমরকে বললেন, خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ فَلَهِىَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ– 'ওকে ছাড় ওমর! এটা ওদের জন্য বর্শার আঘাতের চাইতেও দ্রুত কার্যকরী'।[৩]

মুসলমানদের এই দ্রুতগতির ত্বাওয়াফ ও কার্যক্রম দেখে মুশরিকদের ধারণা পাল্টে গেল এবং বলতে লাগল যে, তোমাদের ধারণা ছিল ভুল। هَؤُلاَءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا 'বরং ওরা তো দেখছি অমুক অমুকের চাইতে বেশী শক্তিশালী'।[৪]

ত্বাওয়াফ শেষে তাঁরা সাঈ করেন এবং এ সময় মারওয়ার নিকটে তাদের কুরবানীর পশুগুলি দাঁড়ানো ছিল। সাঈ শেষে রাসূল (ছাঃ) সেখানে গিয়ে বললেন, هَذَا الْمَنْحَرُ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ 'এটাই হ'ল কুরবানীর স্থান এবং মক্কার সকল অলি-গলি হ'ল কুরবানীর স্থল'।[৫] অতঃপর তিনি সেখানে উটগুলি নহর করেন এবং মাথা মুণ্ডন করেন। মুসলমানেরাও তাই করেন।

এভাবে হালাল হওয়ার পর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একদল ছাহাবীকে ইয়াজেজ পাঠিয়ে দেন, যাতে তারা সেখানে গিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র পাহারায় থাকে এবং অন্যদের ওমরাহ্র জন্য পাঠিয়ে দেয়।

১. *ফাৎহুল বারী ৭/৫৭২ হা/৪২৫২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; 'যুদ্ধ বিগ্রহ' অধ্যায়-৬৪, 'ক্বাযা ওমরাহ' অনুচ্ছেদ-৪৩।*

২. *বুখারী হা/৪২০৬; মুসলিম হা/১২৬৬।*

৩. *তিরমিযী 'শিষ্টাচার ও অনুমতি প্রার্থনা' অধ্যায়, 'কবিতা আবৃত্তি' অনুচ্ছেদ হা/২৮৪৭; নাসাঈ হা/২৮৭৩।*

৪. *মুসলিম হা/১২৬৬।*

৫. *আবুদাঊদ হা/২৩২৪।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় তিনদিন অবস্থান করেন। চতুর্থ দিন সকালে মুশরিক নেতারা এসে আলী (রাঃ)-কে বলেন যে, সন্ধি চুক্তি অনুযায়ী তিনদিনের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। এবার তোমাদের নেতাকে যেতে বল। তখন রাসূল (ছাঃ) মক্কা থেকে বেরিয়ে এসে 'সারফ' (السرف) নামক স্থানে অবস্থান করেন।

মক্কা থেকে বেরিয়ে আসার সময় সাইয়েদুশ শুহাদা হযরত হামযা (রাঃ)-এর শিশুকন্যা আমাতুল্লাহ হে চাচা হে চাচা (يا عم يا عم) বলতে বলতে ছুটে আসে। হযরত আলী (রাঃ) তাকে কোলে তুলে নেন। এরপর আলী, জা'ফর ও যায়েদ বিন হারেছাহ্র মধ্যে বিতর্ক হয়। কেননা সবাই তাকে নিতে চান। তখন রাসূল (ছাঃ) জা'ফরের অনুকূলে ফায়ছালা দিলেন। কেননা জা'ফরের স্ত্রী আসমা বিনতে উমায়েস (أسماء بنت عميس) ছিলেন মেয়েটির আপন খালা।[৬]

মায়মূনার সাথে রাসূলের বিবাহ :

অত্র ওমরাহ পালন শেষে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মায়মূনাহ বিনতুল হারেছকে বিবাহ করেন। ইতিপূর্বে তাঁর দু'বার বিয়ে হয়েছিল এবং এ সময় তিনি বিধবা ছিলেন। তিনি হযরত খালেদ ইবনু ওয়ালীদের আপন খালা এবং রাসূলের চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের আপন শ্যালিকা ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের মা উম্মুল ফযল ছিলেন তার আপন বড় বোন। বিধবা হওয়ার পরে আব্বাস তার বিষয়ে আল্লাহ্র রাসূলকে ইতিপূর্বে জানিয়েছিলেন। সেমতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) জা'ফর ইবনু আবী ত্বালেবকে আগেই মক্কায় পাঠিয়ে দেন। চাচা আব্বাসের দায়িত্বে বিবাহের যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন হয় এবং যথাসময়ে বিবাহ হয়ে যায়। মক্কা থেকে বেরিয়ে আসার সময় আব্বাস-এর গোলাম আবু রাফে' (ابو رافع) যে গোপনে মুসলমান ছিল, তাকে দায়িত্ব দিয়ে আসেন যাতে মায়মূনাকে সওয়ারীতে বসিয়ে রাসূলের কাছে নিয়ে আসে। সেমতে তাঁকে 'সারফে' পৌঁছে দেওয়া হয়। যেখানে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কাফেলা সহ অবস্থান করছিলেন।[৭] এভাবে ওমরাহ সমাপ্ত হয়।

এই ওমরাহ চারটি নামে পরিচিত। যথা- ওমরাতুল ক্বাযা (হুদায়বিয়ার ওমরাহ্র ক্বাযা হিসাবে), ওমরাতুল ক্বাযিইয়াহ (হোদায়বিয়াহ্র ফায়ছালার প্রেক্ষিতে), ওমরাতুল ক্বিছাছ (হোদায়বিয়ার ওমরাহ্র বদলা হিসাবে), ওমরাতুছ ছুলহি (সন্ধির ওমরাহ)। তবে দ্বিতীয়টিকে বিদ্বানগণ অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

৬. *আহমাদ হা/৭৭০; ছহীহাহ হা/১১৮২।*
৭. *যাদুল মা'আদ ৩/৩২৮-২৯।*

মক্কা বিজয় (غزوة فتح مكة)

(৮ম হিজরী ১৭ই রামাযান মঙ্গলবার; ৬৩০ খৃঃ, ১লা জানুয়ারী)

জন্মভূমি মক্কা হ'তে হিজরত করার প্রায় আট বছর পর বিজয়ীর বেশে পুনরায় মক্কায় ফিরে এলেন মক্কার শ্রেষ্ঠ সন্তান বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত, নবীকুল শিরোমণি শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। বিনা যুদ্ধেই মক্কার নেতারা তাঁর নিকটে আত্মসমর্পণ করলেন। এতদিন যারা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ। বিজয়ী রাসূল (ছাঃ) তাদের কারু প্রতি কোনরূপ প্রতিশোধ নিলেন না। সবাইকে উদারতা ও ক্ষমার চাদরে ঢেকে দিয়ে বললেন, 'আজ তোমাদের উপরে কোনরূপ অভিযোগ নেই, তোমরা মুক্ত'। কিন্তু কি ছিল এর কারণ? কিভাবে ঘটলো হঠাৎ করে এ ঐতিহাসিক বিজয়? দু'বছর আগেও যে মুসলিম বাহিনীতে তিন হাযার লোক সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য ছিল, তারা কোথা থেকে কিভাবে দশ হাযার লোক নিয়ে ঝড়ের বেগে হঠাৎ ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হ'ল মক্কার উপরে? অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল মক্কার নেতারা ফ্যালফ্যাল করে। অথচ টুঁ শব্দটি করার ক্ষমতা কারু হ'ল না? নিমেষে বন্ধ হয়ে গেল মক্কা-মদীনা সংঘাত। পৌত্তলিক মক্কা দু'দিনের মধ্যেই হয়ে গেল মুসলমান। কা'বা গৃহ হ'ল মূর্তিশূন্য। উয্যার বদলে শুরু হ'ল আল্লাহ্র জয়গান। শিরকী সমাজ পরিবর্তিত হ'ল ইসলামী সমাজে। সমস্ত আরব উপদ্বীপে বয়ে চলল শান্তির সুবাতাস। কি সে কারণ? কিভাবে সম্ভব হ'ল এই অসম্ভব কাণ্ড? এক্ষণে আমরা সে বিষয়ে আলোকপাত করব।-

অভিযানের কারণ : প্রায় দু'বছর পূর্বে ৬ষ্ঠ হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে সম্পাদিত হোদায়বিয়াহর চার দফা সন্ধিচুক্তির তৃতীয় দফায় বর্ণিত ছিল যে, 'যে সকল গোত্র মুসলমান বা কুরায়েশ যে পক্ষের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে, তারা তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে এবং তাদের কারু উপরে অত্যাচার করা হ'লে সংশ্লিষ্ট দলের উপরে অত্যাচার বলে ধরে নেওয়া হবে'। উক্ত শর্তের আওতায় মক্কার নিকটবর্তী গোত্র বনু খোযা'আহ (بنو خزاعة) মুসলমানদের সাথে এবং বনু বকর কুরায়েশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সংশ্লিষ্ট দলের মিত্রপক্ষ হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু দু'বছর পুরা না হ'তেই বনু বকর উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করল এবং ৮ম হিজরীর শা'বান মাসে রাত্রির অন্ধকারে বনু খোযা'আহ্র উপরে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে বহু লোককে হতাহত করল। ঐসময় বনু খোযা'আহ গোত্র 'ওয়াতীর' (الوتير) নামক প্রস্রবনের ধারে বসবাস করত, যা ছিল মক্কার নিম্নভূমিতে অবস্থিত *(মু'জামুল বুলদান)*। বনু বকরের এই অন্যায় আক্রমনে কুরায়েশদের ইন্ধন ছিল। তারা অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছিল। এমনকি কুরায়েশ নেতা ইকরিমা বিন আবু জাহ্ল, ছাফওয়ান বিন উমাইয়া এবং খোদ হোদায়বিয়া সন্ধিচুক্তিতে কুরায়েশ পক্ষের আলোচক ও স্বাক্ষর দানকারী সোহায়েল বিন আমর সশরীরে উক্ত হামলায় অংশগ্রহণ করেন *(তারীখে ত্বাবারী)*।

বনু খোযা'আহ্‌র অসহায় লোকেরা বনু বকরের কাছে করজোড়ে আশ্রয় প্রার্থনা করলেও তারা পরোয়া করেনি। এমনকি তারা পালিয়ে হারাম শরীফে আশ্রয় নিয়ে তাদেরকে إِلَهَكَ إِلَهَكَ 'তোমার প্রভুর দোহাই' 'তোমার প্রভুর দোহাই' বলে মিনতি করলে জবাবে তারা তাচ্ছিল্য করে لاَ إِلَهَ الْيَوْمَ 'আজ কোন প্রভু নেই' বলে নির্দয়ভাবে তাদেরকে হত্যা করেছিল।[৮]

বনু খোযা'আহ গোত্রের এই হৃদয়বিদারক দুঃসংবাদ নিয়ে আমের ইবনু সালেম আল-খোযাঈ ৪০ জনের একটি দল সহ দ্রুত মদীনায় আসেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তখন মসজিদে নববীতে ছাহাবায়ে কেরাম সহ অবস্থান করছিলেন। এমন সময় আমের ইবনু সালেম কবিতা পাঠ করতে করতে রাসূলের সামনে মর্মস্পর্শী ভাষায় তাদের নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং কুরায়েশদের চুক্তি ভঙ্গের কথা বিবৃত করেন। সাড়ে আট লাইনের সেই কবিতার শেষের সাড়ে তিন লাইন ছিল নিম্নরূপ :

إِنَّ قُرَيْشًا أَخْـــلَفُوْكَ الْمَوْعِدَا * وَنَقَضُوْا مِيْثَـــاقَكَ الْمُؤَكَّدَا

وَجَعَلُوْا لِيْ فِيْ كَدَاءٍ رُصَّدَا * وَزَعَمُوْا أَنْ لَسْتُ أَدْعُوْ أَحَدَا

وَهُـــمْ أَذَلُّ وَأَقَـــلُّ عَـــدَدَا * هُمْ بَيَّتُـــوْنَا بِالْوَتِيْـــرِ هُجَّدًا

وَقَتَلُـــوْنَا رُكَّـــعًا وَّسُجَّدَا * فانصر هـــداك الله نصرًا أَيِّدًا

نحن ولدناك فكنتَ ولدًا–

'নিশ্চয়ই কুরায়েশগণ আপনার সাথে করেছে এবং আপনাকে দেওয়া পাক্কা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে'। 'তারা 'কাদা' নামক স্থানে আমার জন্য ওঁৎ পেতে আছে। তারা ধারণা করেছে যে আমি সাহায্যের জন্য কাউকে আহ্বান করবো না'। 'তারা নিকৃষ্ট ও সংখ্যায় অল্প'। 'তারা 'ওয়াতীর' নামক স্থানে রাত্রি বেলায় ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের উপরে হামলা চালিয়েছে'।

'এবং তারা রুকূ অবস্থায় ও সিজদারত অবস্থায় আমাদেরকে হত্যা করেছে'। অতএব আপনি আমাদেরকে দৃঢ়হস্তে সাহায্য করুন। 'আল্লাহ আপনাকে হেদায়াত করুন'। 'আমরা আপনাকে প্রসব করেছি। অতএব আপনি আমাদের সন্তান'।[৯]

কবিতার শেষের চরণ দ্বারা বুঝা যায় যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তখন মুসলমান হয়েছিলেন। যদিও জীবনীকারগণ এ বিষয়ে একমত যে, ঐ সময় পর্যন্ত তারা মুসলমান হয়নি।[১০]

বনু খোযা'আহ্‌র পরিচয় :

উল্লেখ্য যে, বনু খোযা'আহ গোত্রের সাথে বনু হাশিমের মৈত্রীচুক্তি আব্দুল মুত্ত্বালিবের যুগ হ'তেই চলে আসছিল। কুরায়েশ বংশের প্রবাদ প্রতীম নেতা কুছাই বিন কেলাবের স্ত্রী অর্থাৎ আবদে মানাফের মা ছিলেন খোযা'আহ গোত্রের মহিলা। সে হিসাবে বনু হাশিমকে তারা তাদের সন্তান মনে করত। তারও পূর্বের ঘটনা ছিল এই যে, বনু খোযা'আহ ছিল এক সময় বায়তুল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধায়ক ও মক্কার শাসনকর্তা। মক্কার সর্দার 'হুলাইল' (حليل) তার কন্যা জুবাই (حِبِّيّ) বা হুবাই-কে কুছাই বিন কেলাবের সাথে বিবাহ দেন এবং বিয়ের সময় বায়তুল্লাহ শরীফের মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব কন্যাকে অর্পণ করেন। সাথে সাথে আবু গাবছান (أبو غبشان)-কে কন্যার উকিল নিয়োগ করেন। হুলাইলের মৃত্যুর পর আবু গাবছান এক মশক শরাবের বিনিময়ে তার উকিলের দায়িত্ব কুছাইকে অর্পণ করেন। এভাবে কুছাই বিন কিলাব তার স্ত্রীর উকিল হিসাবে বায়তুল্লাহ শরীফের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। কুছাই তার মেধা ও দূরদর্শিতার বদৌলতে পুরা কুরায়েশ বংশের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে বরিত হন।

উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে বনু খোযা'আহ সর্বদা বনু হাশিমের মিত্র হিসাবে থাকত। মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও কেবল বনু হাশিমের সন্তান হিসাবে তারা সর্বদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষে অবস্থান নিত।

বনু খোযা'আহ্‌র আবেদনে রাসূলের সাড়া :

আমর ইবনু সালেম-এর মর্মস্পর্শী কবিতা শোনার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে ওঠেন- نُصِرْتَ يَا عَمْرَو بْنَ سَالِمٍ 'তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছ হে আমর ইবনু সালেম'! এমন সময় আসমানে একটি মেঘখণ্ডের আবির্ভাব হয়। তা দেখে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ هَذِهِ السَّحَابَةَ لَتَسْتَهِلُّ بِنَصْرِ بَنِيْ كَعْبٍ 'এই মেঘমালা বনু কা'বের সাহায্যের শুভসংবাদে চমকাচ্ছে'।

এরপর বনু খোযা'আহ্‌র আরেকটি প্রতিনিধিদল নিয়ে বুদাইল বিন অরক্বা আল-খোযাঈ (بديل بن ورقاء الخزاعي) আগমন করেন এবং তাদের গোত্রের কারা কারা নিহত হয়েছে ও কুরায়েশরা কিভাবে বনু বকরকে সাহায্য করেছে, তার পূর্ণ বিবরণ পেশ করেন। অতঃপর তারা মক্কায় ফিরে যান।[১১]

রাসূলের পরামর্শ বৈঠক :

সন্ধিচুক্তি ভঙ্গের পর করণীয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে বৈঠকে বসেন। এক সময় আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলে ওঠেন, كَأَنَّكُمْ بِأَبِيْ سُفْيَانَ قَدْ جَاءَكُمْ لِيَشُدَّ الْعَقْدَ وَيَزِيْدَ فِي الْمُدَّةِ 'আমি যেন তোমাদেরকে আবু সুফিয়ানের সাথে দেখছি যে, সে মদীনায়

৮. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৩৯০।*
৯. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৩৯৪-৯৫।*
১০. *যাদুল মা'আদ ৩/৩৪৯।*

১১. *বায়হাক্বী, যাদুল মা'আদ৩/৩৪৯।*

আসছে তোমাদের কাছে চুক্তি পাকাপোক্ত করার জন্য এবং মেয়াদ বাড়ানোর জন্য'।[১২]

আবু সুফিয়ানের মদীনা আগমন ও আশ্রয় প্রার্থনা :

দূরদর্শী আবু সুফিয়ান বুঝেছিলেন যে, বনু খোযা'আহ্র উপরে এই কাপুরুষোচিত আক্রমণ হোদায়বিয়াহ্র সন্ধিচুক্তির স্পষ্ট লংঘন এবং এর প্রতিক্রিয়া হ'ল মুসলমানদের প্রতিশোধমূলক আক্রমণ, যা ঠেকানোর ক্ষমতা এখন তাদের নেই। তাই তিনি মোটেই দেরী না করে এবং কোন প্রতিনিধি না পাঠিয়ে কোরায়েশ নেতাদের পরামর্শক্রমে সরাসরি নিজেই মদীনা গমন করলেন। পথিমধ্যে খোযা'আহ নেতা বুদাইল বিন অরক্বার সঙ্গে আসফান (عسفان) নামক স্থানে সাক্ষাত হ'লে তিনি মুহাম্মাদের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা অস্বীকার করেন। কিন্তু সুচতুর আবু সুফিয়ান বুদাইলের উটের গোবরের মধ্যে খেজুরের আঁটি পরীক্ষা করে বুঝে নেন যে, বুদাইল মদীনা গিয়েছিল। এতে তিনি আরো ভীত হয়ে পড়েন।

যাইহোক মদীনা পৌঁছে তিনি স্বীয় কন্যা উম্মুল মুমেনীন উম্মে হাবীবাহ্র সাথে সাক্ষাত করেন। এসময় তিনি খাটে বসতে উদ্যত হ'লে কন্যা দ্রুত বিছানা গুটিয়ে নেন ও বলেন, هَذَا فِرَاشُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ نَجَسٌ 'এটি রাসূল (ছাঃ)-এর বিছানা। এখানে আপনার বসার অধিকার নেই। কেননা আপনি অপবিত্র মুশরিক'। অতঃপর আবু সুফিয়ান বেরিয়ে জামাতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গেলেন ও সব কথা বললেন। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) কোন কথা বললেন না। নিরাশ হয়ে তিনি আবুবকর (রাঃ)-এর কাছে গেলেন এবং তাকে রাসূলের নিকটে কথা বলার অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করলেন। অতঃপর ওমরের কাছে গিয়ে একইভাবে তোষামোদ করলেন। কিন্তু ওমর কঠোর ভাষায় জবাব দিয়ে বললেন, أَأَنَا أَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَوَاللهِ لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ الذَّرَّ لَجَاهَدْتُكُمْ بِهِ 'আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের নিকটে সুফারিশ করব? আল্লাহ্র কসম! যদি আমি কিছুই না পাই ছোট নুড়ি ছাড়া, তাই দিয়ে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব'।

এবার সবশেষে তিনি আলী (রাঃ)-এর কাছে গেলেন। এ সময় সেখানে ফাতেমা (রাঃ) ছিলেন এবং তাদের সামনে শিশু হাসান লাফালাফি করে খেলছিলেন। আবু সুফিয়ান সেখানে পৌঁছে আলী (রাঃ)-কে অত্যন্ত বিনয়ের সুরে বললেন, হে আলী! অন্যদের তুলনায় তোমার সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক অনেক গভীর। আমি একটি বিশেষ প্রয়োজনে মদীনায় এসেছি। এমনটি যেন না হয় যে, আমাকে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়। اشْفَعْ لِيْ إِلَى محمد 'তুমি আমার জন্য মুহাম্মাদের নিকটে সুফারিশ কর'। জবাবে আলী (রাঃ) বললেন, وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ وَاللهِ لَقَدْ عَزَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَمْرٍ مَا نَسْتَطِيْعُ أَنْ نُكَلِّمَهُ فِيْهِ 'তোমাদের জন্য দুঃখ হে আবু সুফিয়ান! আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একটি বিষয়ে কৃত সংকল্প হয়েছেন, যে বিষয়ে আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি না'। আবু সুফিয়ান তখন ফাতেমা (রাঃ)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, هَلْ لَكِ أَنْ تَأْمُرِيْ بُنَيَّكِ هَذَا فَيُجِيرَ بَيْنَ النَّاسِ فَيَكُوْنَ سَيِّدَ الْعَرَبِ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ؟ 'তুমি কি পারো তোমার এই ছেলেকে হুকুম দিতে যে সে লোকদের মধ্যে আমার জন্য আশ্রয়ের ঘোষণা দিবে এবং এর ফলে সে চিরদিনের জন্য আরবের নেতা হয়ে থাকবে'? ফাতেমা বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমার ছেলের এখনো সেই বয়স হয়নি যে, লোকদের মধ্যে কারু জন্য আশ্রয়ের ঘোষণা দিবে। وَمَا يُجِيْرُ أَحَدٌ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপস্থিতিতে অন্য কেউ কারু আশ্রয়ের ঘোষণা দিতে পারে না'।

সবদিকে নিরাশ হয়ে ভীত-শংকিত আবু সুফিয়ান হযরত আলীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنِّيْ أَرَى الْأُمُوْرَ قَدْ اشْتَدَّتْ عَلَيَّ فَانْصَحْنِيْ 'হে হাসানের পিতা! আমি বুঝতে পারছি আমার উপরে অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় তুমি আমাকে কিছু ভাল উপদেশ দাও'। তখন আলী (রাঃ) তাকে বললেন, وَاللهِ مَا أَعْلَمُ لَكَ شَيْئًا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْئًا، وَلَكِنَّكَ سَيِّدُ بَنِيْ كِنَانَةَ فَقُمْ فَأَجِرْ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ الْحَقْ بِأَرْضِكَ 'আল্লাহ্র কসম! তোমার উপকারে আসে, এমন কোন পথ আমি দেখছি না। তবে যেহেতু তুমি বনু কেনানাহ্র সর্দার। সেহেতু তুমি নিজেই লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আশ্রয় প্রার্থনা কর। অতঃপর নিজ দেশে ফিরে যাও'। আবু সুফিয়ান বললেন, তুমি কি মনে করছ যে, এটা আমার জন্য ফলপ্রসু হবে'? আলী (রাঃ) বললেন, না। আল্লাহ্র কসম! আমি এমনটি ধারণা করি না। তবে তোমার জন্য এর বিকল্প কিছুই আমি দেখছি না'। তখন আবু সুফিয়ান মসজিদে নববীতে গিয়ে দাঁড়ালেন ও লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ قَدْ أَجَرْتُ بَيْنَ النَّاسِ 'হে লোকসকল! আমি সকলের মাঝে আশ্রয় প্রার্থনার ঘোষণা দিচ্ছি'। অতঃপর বেরিয়ে উটে সওয়ার হয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হয়ে যান। আবু সুফিয়ান মক্কায় এসে নেতাদের নিকটে সবকথা পেশ করেন এবং তাদের ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার জবাবে বলেন, وَاللهِ مَا وَجَدْتُ غَيْرَ ذَلِكَ

১২. বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত হা/১৭৫৭, 'সনদ মুরসাল।

'আল্লাহ্‌র কসম! এছাড়া আমি আর কোন পথ খুঁজে পাইনি'।

রাসূলের গোপন প্রস্তুতি :

ত্বাবারাণী হাদীছ গ্রন্থের বর্ণনাসূত্রে জানা যায় যে, কুরায়েশদের চুক্তি ভঙ্গের খবর পৌঁছবার তিন দিন আগেই আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) স্ত্রী আয়েশাকে সফরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ দেন- যা কেউ জানত না। পিতা আবুবকর (রাঃ) কন্যা আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন, يَابُنَيَّةُ، مَا هَذَا الْجِهَازُ؟ 'হে কন্যা! এসব কিসের প্রস্তুতি? কন্যা জবাব দিলেন وَاللهِ مَا أَدْرِيْ 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি জানি না'। আবুবকর (রাঃ) বললেন, এখন তো রোমকদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় নয়। তাহ'লে রাসূল (ছাঃ) কোন দিকের এরাদা করেছেন? আয়েশা (রাঃ) আবার বললেন, وَاللهِ لاَ عِلْمَ لِيْ 'আল্লাহ্‌র কসম! এ বিষয়ে আমার কিছুই জানা নেই'। দেখা গেল যে, তৃতীয় দিন আমর ইবনু সালেম আল-খোযাঈ ৪০ জন সঙ্গী নিয়ে হাযির হ'লেন। তখন লোকেরা চুক্তিভঙ্গের খবর জানতে পারল।[১৩]

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে মক্কা গমনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন এবং আল্লাহ্‌র নিকটে দো'আ করলেন- اللَّهُمَّ خُذِ الْعُيُوْنَ وَالْأَخْبَارَ عَنْ قُرَيْشٍ حَتَّى نَبْغَتَهَا فِيْ بِلاَدِهَا 'হে আল্লাহ! তুমি কুরায়েশদের নিকটে গোয়েন্দা রিপোর্ট এবং এই অভিযানের খবর পৌঁছানোর পথ সমূহ বন্ধ করে দাও। যাতে তাদের অজান্তেই আমরা তাদের শহরে হঠাৎ উপস্থিত হ'তে পারি'।[১৪] অতঃপর বাহ্যিক কৌশল হিসাবে তিনি আবু ক্বাতাদাহ হারেছ বিন রিব্‘ঈ (أبو قتادة الحارث بن رِبْعِي)-এর নেতৃত্বে ৮ সদস্যের একটি দলকে ১লা রামাযান তারিখে 'ইযাম' (بطن إِضم) উপত্যকার দিকে রওয়ানা করে দেন। যাতে শত্রুরা ভাবে যে, অভিযান ঐদিকেই পরিচালিত হবে। পরে তারা গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মিলিত হন।[১৫]

অভিযান পরিকল্পনা ফাঁসের ব্যর্থ চেষ্টা ও চিঠি উদ্ধার : বদর যুদ্ধের নিবেদিতপ্রাণ ছাহাবী এবং রাসূলের দান্দান মুবারক শহীদকারী উৎবা বিন আবী ওয়াক্কাছের হত্যাকারী প্রসিদ্ধ বীর হযরত আবু বালতা'আহ (রাঃ) রাসূলের আসন্ন মক্কা অভিযানের খবর দিয়ে একটি পত্র লিখে এক মহিলার মাধ্যমে গোপনে মক্কায় প্রেরণ করেন। অহি-র মাধ্যমে খবর অবগত হয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আলী ও মিক্বদাদ (রাঃ)-কে দ্রুত পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দিয়ে বলেন, তোমরা 'খাখ' (رَوْضَةُ خَاخٍ) নামক বাগিচায় গিয়ে একজন হাওদা নশীন মহিলাকে পাবে, যার কাছে কুরায়েশদের নিকটে লিখিত একটি পত্র রয়েছে'।

১৩. *ত্বাবারাণী কাবীর হা/১০৫২; ঐ, ছগীর হা/৯৬৮; সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৩৯৭; যাদুল মা'আদ ৩/৩৫১।*

১৪. *ফিক্বহুস সীরাহ ১/৩৭৫, সনদ যঈফ।*

১৫. *ওয়াক্বেদী, কিতাবুল মাগাযী, 'মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ, ২/৩২৩; আর-রাহীক্ব ৩৯৭ পৃঃ।*

তারা অতি দ্রুত পিছু নিয়ে ঠিক সেখানে গিয়েই মহিলাকে পেলেন ও তাকে পত্রের কথা জিজ্ঞেস করলেন। মহিলা অস্বীকার করলে তার হাওদা তল্লাশি চালানো হ'ল। কিন্তু না পেয়ে হযরত আলী তাকে বললেন, مَا كَذَبَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) মিথ্যা বলেননি, আল্লাহ্‌র কসম! অবশ্যই তুমি চিঠিটি বের করে দেবে, নইলে অবশ্যই আমরা তোমাকে উলঙ্গ করব'। তখন মহিলা ভয়ে তার মাথার খোঁপা থেকে চিঠিটা বের করে দিল। পত্রখানা নিয়ে তারা মদীনায় ফিরে এলেন। তখন হাতেবকে ডেকে রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি বললেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ، لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ، مَا بِيْ إِلاَّ أَنْ أَكُوْنَ مُؤْمِنًا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَا غَيَّرْتُ وَلاَ بَدَّلْتُ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে বিশ্বাসী। আমি ধর্মত্যাগী হইনি বা আমার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তনও আসেনি'। তবে ব্যাপারটি হ'ল এই যে, আমি কুরায়েশদের সাথে সম্পৃক্ত (ملحق) একজন ব্যক্তি মাত্র। তাদের গোত্রভুক্ত নই। অথচ তাদের মধ্যে রয়েছে আমার পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও সন্তান-সন্ততি। তাদের সাথে আমার কোন আত্মীয়তা নেই, যারা তাদের হেফাযত করবে। অথচ আপনার সাথে যেসকল মুহাজির আছেন, তাদের সেখানে আত্মীয়-স্বজন আছে, যারা তাদের পরিবারকে নিরাপত্তা দিতে পারে। এজন্য আমি চেয়েছিলাম যে, তাদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি দেখাই, যাতে তারা আমার পরিবারকে নিরাপত্তা দেয়'। তখন ওমর (রাঃ) বলে উঠলেন, হে রাসূল! আমাকে ছেড়ে দিন আমি ওর গর্দান উড়িয়ে দিই। কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করেছে এবং সে অবশ্যই মুনাফেকী করেছে'। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إنه قد شهد بدراً 'সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল'। তোমার কি জানা নেই হে ওমর! আহলে বদর সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ 'তোমরা যা খুশী করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি'। একথা শুনে ওমরের দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল এবং তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত'।[১৬]

মক্কার পথে রওয়ানা :

৮ম হিজরীর ১০ই রামাযান মঙ্গলবার ১০,০০০ সাথী নিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। এই সময় মদীনার দায়িত্বশীল নিযুক্ত করে যান আবু রুহম কুলছূম আল-গেফারী (রাঃ) (أبو رُهم كلثوم الغفاري)-কে।[১৭]

১৬. *বুখারী হা/৩৬৮৪ 'মাগাযী' অধ্যায়, 'বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।*

১৭. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৩৯৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৪১।*

পথিমধ্যের ঘটনাবলী :

(১) জুহফা (الجحفة) বা তার কিছু পরে পৌঁছে রাসূলের প্রিয় চাচা আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্ত্বালিবের সাথে সাক্ষাৎ হয়। যিনি পরিবার-পরিজনসহ মুসলমান হয়ে মদীনার পথে হিজরতে বের হয়েছিলেন।

(২) আবওয়া (الأبواء) : যেখানে রাসূলের মা আমেনার কবর রয়েছে- সেখানে পৌঁছলে রাসূলের চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান মুগীরাহ ইবনুল হারেছ এবং ফুফাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়ার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তাদের দেখে রাসূল (ছাঃ) মুখ ফিরিয়ে নেন। কারণ তারা কঠিন নির্যাতন ও কুৎসা রটনার মাধ্যমে (من شدة الأذى والهجو) রাসূলকে খুবই কষ্ট দিয়েছিল। এ অবস্থা দেখে উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এমনটি হওয়া উচিত নয় যে আপনার চাচাতো ভাই ও ফুফাতো ভাই আপনার কাছে সবচেয়ে বেশী হতভাগ্য হবে (اشقى الناس بك)। কিন্তু তাতে রাসূল (ছাঃ) রাযী না হওয়ার খবর জানতে পেরে তারা বলে উঠলেন, আল্লাহ্‌র কসম! হয় আল্লাহ্‌র রাসূল আমাদেরকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দিবেন, না হয় আমরা আমাদের সন্তানাদি নিয়ে একদিকে চলে যাব। অতঃপর ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় মারা যাব'। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্তর নরম হ'ল এবং তাদেরকে অনুমতি দিলেন'।[১৮] অন্যদিকে হযরত আলী (রাঃ) আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেছকে শিখিয়ে দিলেন যে, তুমি রাসূলের সম্মুখে গিয়ে সেই কথাগুলি বল, যা ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁকে বলেছিলেন- تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِيْنَ (يوسف ٩١) 'আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ আপনাকে আমাদের উপরে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম' *(ইউসুফ ১২/৯১)*। কারণ এর চাইতে কারু কোন উত্তম কথা তিনি পসন্দ করবেন না। অতএব আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেছ তাই করলেন। আর সাথে সাথে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) সেই জবাবই দিলেন, যা ইউসুফ (আঃ) তার ভাইদের দিয়েছিলেন- لاَ تَثْرَيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (يوسف ٩٢) 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি হ'লেন দয়ালুদের সেরা দয়ালু' *(ইউসুফ ১২/৯২)*। আবু সুফিয়ান ছিলেন আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং রাসূলের বড় চাচা হারেছ-এর পুত্র। তিনিও হালীমা সা'দিয়াহ্‌র দুধ পান করেছিলেন। সেকারণে রাসূল (ছাঃ) ছিলেন তার দুধ ভাই। রাসূল (ছাঃ) তাকে ক্ষমা করে দিলে খুশীতে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয় লাইনের একটি কবিতা পাঠ করেন। তার মধ্যে ৩য় লাইনে তিনি বলেন,

هَدَانِي هادٍ غيرُ نفسي ودَلَّنِي * على الله مَنْ طَرَّدتُ كُلَّ مُطَرَّدٍ

'আমার নফস ব্যতীত অন্য একজন পথপ্রদর্শক আমাকে পথ দেখিয়েছেন এবং আমাকে আল্লাহ্‌র পথের সন্ধান দিয়েছেন, যাকে সকল প্রকারের তিরষ্কারের মাধ্যমে আমি তাড়িয়ে দিতাম'। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার বুকে থাবা মেরে বললেন, أَنْتَ طَرَّدْتَنِيْ كُلَّ مُطَرَّدٍ 'তুমিই তো আমাকে সর্বদা তাড়িয়ে দিতে'।[১৯]

উল্লেখ্য যে, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তিনি কখনো লজ্জায় রাসূলের সামনে মাথা উঁচু করে কথা বলতেন না। মক্কা বিজয়ের মাত্র ১৯ দিন পরে হোনায়েনের যুদ্ধে যে কয়জন ছাহাবী রাসূলের সাথে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি কোনমতেই রাসূলের উটের লাগাম ছাড়েননি। তাঁর ছেলে জাফর হোনায়েন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। দুই ছেলে জাফর ও আব্দুল্লাহ ছাহাবী ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে খুবই ভালবাসতেন এবং বলতেন, أَرْجُو أَنْ يَكُوْنَ خَلَفًا مِنْ حَمْــزَةَ 'আশা করি তিনি হামযাহ্‌র স্থলাভিষিক্ত হবেন'। তিনি তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। রাসূলের ওফাতের পর তিনি যে ১০ লাইনের শোকগাথা পাঠ করেন, তা ছিল অতীব মর্মস্পর্শী ও হৃদয় বিদারক। ২০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি বলেন, لاَ تَبْكُوْا عَلَيَّ فَوَاللهِ مَا نَطَقْتُ بِخَطِيئَةٍ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، 'তোমরা আমার জন্য কেঁদো না। আল্লাহ্‌র কসম! ইসলাম গ্রহণের পর হ'তে আমি কোন গোনাহের কথা বলিনি'।[২০]

ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়া যিনি রাসূলের ফুফু আতেকার পুত্র ছিলেন। প্রথম দিকে ইসলামের ঘোর দুশমন থাকলেও ইসলাম গ্রহণের পর সর্বক্ষণ রাসূলের সহযোগী ছিলেন। তিনি রাসূলের সাথে মক্কা বিজয়, হোনায়েন যুদ্ধ ও তায়েফ যুদ্ধে যোগদান করেন এবং তায়েফে শত্রুপক্ষের তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন।

(৩) মার্রুয যাহরানে অবতরণ : মক্কায় প্রবেশের আগের রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিকটবর্তী মার্রুয যাহরান উপত্যকায় অবতরণ করেন এবং প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে আগুন জ্বালাতে বলেন। তাতে সমগ্র উপত্যকা দশ হাযার অগ্নিপিণ্ডের এক বিশাল আলোক নগরীতে পরিণত হয়। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবকে পাহারাদার বাহিনীর প্রধান নিয়োগ করা হয়।

মক্কাবাসীদের উপরে আসন্ন বিপদ আঁচ করে হযরত আব্বাস (রাঃ) অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি মনেপ্রাণে চাচ্ছিলেন যে, উপযুক্ত কোন লোক পেলে তিনি তাকে দিয়ে

১৮. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৪০০; আর-রাহীক্ব ৩৯৯ পৃঃ।*

১৯. *হাকেম, ফিক্বহুস সীরাহ ১/৩৭৬, সনদ হাসান।*

২০. *যাদুল মা'আদ ৩/৩৫২-৩৫৩।*

খবর পাঠাবেন যে, রাসূলের মক্কায় প্রবেশের পূর্বেই কুরায়েশ নেতারা অনতিবিলম্বে এসে যেন রাসূলের নিকটে আত্মসমর্পণ করে। তিনি রাসূলের সাদা খচ্চরের (البيضاء) উপরে সওয়ার হয়ে রাতের আঁধারে বেরিয়ে পড়েন।

আবু সুফিয়ান গ্রেফতার : ওদিকে ভীত ও শংকিত কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ান, হাকীম বিন হেযাম ও খোযা'আহ নেতা বুদাইল বিন ওয়ারক্বা মুসলমানদের খবর জানার জন্য রাত্রিতে ময়দানে বের হয়ে এসেছিলেন। তারা হঠাৎ গভীর রাতে দিগন্তব্যাপী আগুনের মিছিল দেখে হতচকিত হয়ে পড়েন ও একে অপরে নানারূপ আশংকার কথা বলাবলি করতে থাকেন। এমন সময় হযরত আব্বাস (রাঃ) তাদের কণ্ঠস্বর চিনতে পারেন ও কাছে এসে বলেন, কি দেখছ, এগুলি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সেনাবাহিনীর জ্বালানো আগুন। ভীত চকিত আবু সুফিয়ান বলে উঠলেন, فَمَا الْحِيْلَةُ فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ 'তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গীত হৌক- এখন উপায় কি? আব্বাস (রাঃ) বললেন, وَاللهِ لَئِنْ ظَفِرَ بِكَ لَيَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ 'আল্লাহ্র কসম! তোমাকে পেয়ে গেলে তিনি অবশ্যই তোমার গর্দান উড়িয়ে দেবেন'। অতএব এখুনি আমার খচ্চরের পিছনে উঠে বস এবং চলো রাসূলের কাছে গিয়ে আমি তোমার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করে আবু সুফিয়ান খচ্চরের পিছনে বসলেন এবং তার সাথী দু'জন ফিরে গেলেন।

রাসূলের তাঁবুতে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত সকলে রাসূলের সাদা খচ্চর ও তাঁর চাচা আব্বাসকে দেখে সসম্মানে পথ ছেড়ে দিয়েছে। ওমরের নিকটে পৌঁছলে তিনি উঠে কাছে এলেন এবং পিছনে আবু সুফিয়ানকে দেখেই বলে উঠলেন, أَبُو سُفْيَانَ عَدُوُّ اللهِ 'আবু সুফিয়ান, আল্লাহ্র দুশমন! আলহামদুলিল্লাহ কোনরূপ চুক্তি ও অঙ্গীকার ছাড়াই আল্লাহ তোমাকে আমাদের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছেন'। বলেই তিনি রাসূলের তাঁবুর দিকে চললেন। আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমিও দ্রুত খচ্চর হাঁকিয়ে দিলাম এবং তার আগেই রাসূলের নিকটে পৌঁছে গেলাম ও তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ট হ'লাম। ইতিমধ্যে ওমর এসে পৌঁছলেন এবং বললেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا أَبُوْ سُفْيَانَ فَدَعْنِيْ أَضْرِبْ عُنُقَهُ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! এই সেই আবু সুফিয়ান! আমাকে হুকুম দিন ওর গর্দান উড়িয়ে দিই'। আব্বাস (রাঃ) তখন রাসূলকে বললেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّيْ قَدْ أَجَرْتُهُ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি'। অতঃপর আমি রাসূলের কাছে উঠে গিয়ে কানে কানে বললাম, وَاللهِ لاَ يُنَاجِيْهِ اللَّيْلَةَ أَحَدٌ دُوْنِيْ 'আল্লাহ্র কসম! আমি ছাড়া অন্য কেউ আজ রাতে আপনার সাথে গোপনে কথা বলবে না'। এরপর ওমর ও আব্বাসের মধ্যে কিছু বাক্য বিনিময় হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আব্বাস! এঁকে আপনার তাঁবুতে নিয়ে যান। সকালে ওঁকে নিয়ে আমার কাছে আসুন'।

আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ : সকালে তাঁর নিকটে গেলে তিনি আবু সুফিয়ানকে বললেন, وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟ 'তোমার জন্য দুঃখ হে আবু সুফিয়ান! আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, একথা উপলব্ধি করার সময় কি তোমার এখনো আসেনি'? আবু সুফিয়ান বললেন, بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ مَا أَحْلَمَكَ وَأَكْرَمَكَ وَأَوْصَلَكَ لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنْ لَوْ كَانَ مَعَ اللهِ إِلَهٌ غَيْرُهُ لَقَدْ أَغْنَى شَيْئًا بَعْدُ 'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীত হউন। আপনি কতইনা সহনশীল, কতই না সম্মানিত ও কতই না আত্মীয়তা রক্ষাকারী! আমি বুঝতে পেরেছি যে, যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য থাকত, তাহ'লে এতদিন তা আমার কাজে আসত'। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ؟ 'তোমার জন্য দুঃখ হে আবু সুফিয়ান! আমি যে আল্লাহ্র রাসূল একথা উপলব্ধি করার সময় কি তোমার এখনো আসেনি'? আবু সুফিয়ান বললেন, আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গীত হৌন! আপনি কতই না সহনশীল, কতই না সম্মানিত এবং কতই না আত্মীয়তা রক্ষাকারী, أَمَّا هَذِهِ فَإِنَّ فِي النَّفْسِ حَتَّى الْآنَ مِنْهَا شَيْئًا- 'কেবল এই ব্যাপারটিতে মনের মধ্যে এখনো কিছু সংশয় রয়েছে'। সঙ্গে সঙ্গে ধমকের সুরে আব্বাস (রাঃ) তাকে বলে উঠলেন, وَيْحَكَ أَسْلِمْ وَاشْهَدْ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ قَبْلَ أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُكَ- 'তোমার ধ্বংস হৌক! গর্দান যাওয়ার পূর্বে ইসলাম কবুল কর এবং সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল'। সঙ্গে সঙ্গে আবু সুফিয়ান ইসলাম কবুল করলেন ও কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন।

অতঃপর হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ الْفَخْرَ فَاجْعَلْ لَهُ شَيْئًا 'আবু সুফিয়ান গৌরব প্রিয় ব্যক্তি। অতএব এ ব্যাপারে তাকে কিছু প্রদান করুন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, نَعَم مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِيْ سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السَّلاَحَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُوَ آمِنٌ 'হ্যাঁ' যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নিবে সে নিরাপদ থাকবে। যে ব্যক্তি তার ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে সে নিরাপদ থাকবে। যে ব্যক্তি অস্ত্র ফেলে দেবে, সে নিরাপদ থাকবে এবং

যে ব্যক্তি মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ থাকবে'।[২১]

মুসলিম বাহিনী মক্কার উপকণ্ঠে :

১৭ই রামাযান মঙ্গলবার সকালে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) মার্রুয যাহরান ত্যাগ করে মক্কায় প্রবেশের জন্য যাত্রা শুরু করলেন। তিনি আব্বাসকে বললেন যে, আপনি আবু সুফিয়ানকে নিয়ে উপত্যকা থেকে বের হওয়ার মুখে সংকীর্ণ পথের পার্শ্বে পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে থাকবেন। যাতে সে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ও শক্তি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারে। আব্বাস (রাঃ) তাই-ই করলেন। এরপর যখনই স্ব স্ব গোত্রের পতাকা সহ এক একটি গোত্র ঐ পথ অতিক্রম করে, তখনই আবু সুফিয়ান আব্বাসের নিকটে ঐ গোত্রের পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। যেমন আসলাম, গেফার, জোহায়না, মুযায়না, বনু সোলায়েম ও অন্যান্য গোত্র সমূহ। কিন্তু আবু সুফিয়ান ঐসব লোকদের তেমন মূল্যায়ন না করে বলেন, এদের সাথে আমার কি সম্পর্ক? এরপরে যখন আনছার ও মুহাজির পরিবেষ্টিত হয়ে লোহার বর্ম পরিহিত অবস্থায় জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে একটি বিরাট দলকে আসতে দেখলেন তখন আবু সুফিয়ান বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ হে আব্বাস এরা কারা? আব্বাস (রাঃ) বললেন, মুহাজির ও আনছার বেষ্টিত হয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আসছেন'। আবু সুফিয়ান বললেন, مَا لِأَحَدٍ بِهَؤُلَاءِ قِبَلٌ وَلَا طَاقَةٌ 'কারু পক্ষে এদের সাথে মুক্বাবিলার শক্তি হবে না'। অতঃপর বললেন, হে আবুল ফযল! لَقَدْ أَصْبَحَ مُلْكُ ابْنِ أَخِيْكَ الْيَوْمَ عَظِيْمًا 'তোমার ভাতিজার সাম্রাজ্য তো আজকে অনেক বড় হয়ে গেছে'। আব্বাস (রাঃ) বললেন, يَا أَبَا سُفْيَانَ إِنَّهَا النُّبُوَّةُ 'হে আবু সুফিয়ান, এটা (রাজত্ব নয় বরং) নবুঅত'। আবু সুফিয়ান বললেন, نَعَمْ إِذَنْ 'হাঁ, তাহ'লে তাই'।[২২]

সা'দের পতাকা হস্তান্তর : এ সময় একটি ঘটনা ঘটে যায়। আনছারদের পতাকা ছিল খাযরাজ নেতা সা'দ বিন ওবাদাহ (রাঃ)-এর হাতে। তিনি ইতিপূর্বে ঐ স্থান অতিক্রম করার সময় আবু সুফিয়ানকে শুনিয়ে বলেন, الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْحُرْمَةُ، الْيَوْمَ أَذَلَّ اللهُ قُرَيْشًا 'আজ হ'ল মারপিটের দিন। আজ হারামকে হালাল করা হবে। আজ আল্লাহ কুরায়েশকে অপদস্থ করবেন'। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ঐ স্থান অতিক্রম করার সময় আবু সুফিয়ান বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি শুনেছেন সা'দ কি বলেছে? জিজ্ঞেস করলেন কি বলেছে? তখন তাকে সব বলা হ'ল। সেকথা শুনে হযরত ওছমান ও আব্দুর রহমান ইবনু 'আওফ রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, আমরা সা'দের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত নই। হয়ত সে কুরায়েশদের মারপিট শুরু করে দেবে'। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, بَلِ الْيَوْمَ يَوْمٌ تُعَظَّمُ فِيْهِ الْكَعْبَةُ، الْيَوْمَ يَوْمٌ أَعَزَّ اللهُ فِيْهِ قُرَيْشًا 'বরং আজকের দিনটি হবে কা'বা গৃহের প্রতি যথার্থ মর্যাদা প্রদর্শনের দিন। আজকের দিনটি হবে সেই দিন, যেদিন আল্লাহ কুরায়েশ বংশের যথার্থ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করবেন'।[২৩] অতঃপর তিনি একজনকে পাঠিয়ে সা'দের নিকট থেকে পতাকা নিয়ে তার পুত্র ক্বায়েমকে দিলেন। যাতে সে বুঝতে পারে যে, পতাকা তার হাত থেকে বাইরে যায়নি। তবে কেউ কেউ বলেন, পতাকাটি যুবায়ের (রাঃ)-কে প্রদান করা হয়।

মুসলিম বাহিনী কুরায়েশদের মাথার উপরে :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অতিক্রম করে যাওয়ার পর হযরত আব্বাস (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে বললেন, النَّجَاءُ إِلَى قَوْمِكَ 'তোমার কওমের দিকে দৌড়াও'। আবু সুফিয়ান অতি দ্রুত মক্কায় গিয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ هَذَا مُحَمَّدٌ قَدْ جَاءَكُمْ فِيْمَا لَا قِبَلَ لَكُمْ بِهِ فَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِيْ سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ 'হে কুরায়েশগণ! মুহাম্মাদ এসে গেছেন, যার মুকাবিলা করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। অতএব যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ থাকবে'। এ ঘোষণা শুনে তার স্ত্রী হিন্দা এসে তার মোচ ধরে বলে ওঠেন, এই চর্বিওয়ালা শক্ত মাংসধারী মশকটাকে তোমরা মেরে ফেল। এরূপ দুঃসংবাদ দানকারীর মন্দ হৌক'! আবু সুফিয়ান বললেন, তোমরা সাবধান হও! এই মহিলা যেন তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে। লোকেরা বলল, হে আবু সুফিয়ান! তোমার ঘরে কয়জনের স্থান হবে? তিনি বললেন, مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ 'যে ব্যক্তি তার নিজের ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে, সে নিরাপদ থাকবে এবং যে ব্যক্তি মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, সেও নিরাপদ থাকবে'। একথা শোনার পর লোকেরা স্ব স্ব ঘর ও বায়তুল্লাহ্‌র দিকে দৌড়াতে শুরু করল।[২৪] কিন্তু কিছু সংখ্যক নির্বোধ লোক ইকরিমা বিন আবু জাহল, ছাফওয়ান বিন উমাইয়া, সোহায়েল বিন আমর প্রমুখের নেতৃত্বে মক্কার 'খান্দামা' (الخندمة) পাহাড়ের কাছে গিয়ে জমা হ'ল মুসলিম বাহিনীকে বাধা দেওয়ার জন্য। এদের মধ্যে কুরায়েশ মিত্র বনু বকরের জনৈক বীর পুঙ্গব হামাস বিন ক্বায়েস (حماس بن قيس) ছিল। যে ব্যক্তি মুসলমানদের মুকাবিলার জন্য ধারালো

---

২১. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৪০৩; মুসলিম, মিশকাত হা/৬২১০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৪১।*

২২. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৪০৪; ছহীহাহ হা/৩৩৪১।*

২৩. *বুখারী হা/৪২৮০।*

২৪. *ছহীহাহ হা/৩৩৪১।*

অস্ত্র শান দিয়েছিল এবং মুসলমানদের ধরে এনে তার স্ত্রীর গোলাম বানাবার অহংকার প্রদর্শন করে স্ত্রীর সামনে কবিতা পাঠ করেছিল।[২৫]

খান্দামায় মুকাবিলা ও হতাহতের ঘটনা :

মুসলিম বাহিনী খান্দামায় পৌঁছানোর পর ডান বাহুর সেনাপতি খালেদ ইবনে ওয়ালীদের সাথে তাদের মুকাবিলা হয়। তাতে ১২ জন নিহত হওয়ার পর তাদের মধ্যে পালানোর হিড়িক পড়ে যায়। কিন্তু এই সময় খালেদ বাহিনীর দু'জন শহীদ হন, যারা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তারা হ'লেন কুরয বিন জাবের আল-ফিহরী এবং খুনায়েস বিন খালেদ বিন রাবী'আহ। মানছূরপুরী এই ব্যক্তির নাম হুবায়েশ (حبيش) বলেছেন এবং এ দু'জনকে قتيل البطحاء বলে অভিহিত করেছেন। হুবায়েশ বিন খালেদ খ্যাতনামা মহিলা উম্মে মা'বাদের ভাই ছিলেন। এসময় বনু বকরের সেই মহাবীর হামাস ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এসে স্ত্রীকে বলে 'শীঘ্র দরজা বন্ধ কর'। স্ত্রী ঠাট্টা করে বলেন, কোথায় গেল তোমার সেই বীরত্ব? ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে কবিতাকারে (সাড়ে তিন লাইন) বলল, যদি তুমি ছাফওয়ান ও ইকরিমার পালানোর দৃশ্য এবং মাথার খুলি সমূহ উড়ে যাবার সেই ভয়ংকর দৃশ্যগুলো দেখতে, তাহ'লে আমাকে তুমি মোটেই তিরষ্কার করতে পারতে না'।[২৬]

অতঃপর খালেদ মক্কার গলিপথ সমূহ অতিক্রম করে ছাফা পাহাড়ে উপনীত হ'লেন। অন্যদিকে বামবাহুর সেনাপতি যোবায়ের ইবনুল আওয়াম (রাঃ) মক্কার উপরিভাগ দিয়ে প্রবেশ করে হাজূন (الحجون) নামক স্থানে অবতরণ করলেন। একইভাবে আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ পদাতিক বাহিনী নিয়ে বাত্বনে ওয়াদীর পথ ধরে মক্কায় পৌঁছে যান।

বিজয়ীর বেশে রাসূলের মক্কায় প্রবেশ :

অতঃপর আনছার ও মুহাজির পরিবেষ্টিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করলেন ও হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। অতঃপর বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করেন। এই সময় কা'বা গৃহের ভিতরে ও বাইরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাতের ধনুক দ্বারা এগুলি ভাঙতে শুরু করেন এবং কুরআনের এ আয়াত পড়তে থাকেন- وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا 'তুমি বল, হক এসে গিয়েছে, বাতিল অপসৃত হয়েছে'। নিশ্চয়ই বাতিল অপসৃত হয়েই থাকে' *(বনু ইসরাঈল ১৭/৮১)*। তিনি আরও পড়েন, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ 'তুমি বল হক এসে গেছে এবং বাতিল না শুরু হবে, না আর ফিরে আসবে' *(সাবা ৩৪/৪৯)*। অর্থাৎ সত্যের মুকাবিলায় মিথ্যা এমনভাবে পর্যুদস্ত হয় যে, তা কোন বিষয়ের সূচনা বা পুনরাবৃত্তির যোগ্য থাকে না।

অতঃপর ওছমান বিন ত্বালহাকে ডেকে তার কাছ থেকে কা'বা ঘরের চাবি নিয়ে দরজা খুলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ভিতরে প্রবেশ করেন। তিনি সেখানে বহু মূর্তি ও ছবি দেখতে পান। যার মধ্যে হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর দু'টি ছবি বা প্রতিকৃতি ছিল- যাদের হাতে ভাগ্য নির্ধারণী তীর ছিল (يستقسمان بالأزلام)। এ দৃশ্য দেখে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলে ওঠেন, قَاتَلَهُمُ اللهُ لَقَدْ عَلِمُوا مَا اسْتَقْسَمَا بِهَا قَطُّ 'মুশরিকদের আল্লাহ ধ্বংস করুন। আল্লাহ্র কসম! তারা জানে যে, তাঁরা কখনোই এ ধরনের তীর ব্যবহার করেননি'।[২৭] তিনি সেখানে একটা কাঠের তৈরী কবুতরী দেখেন। যেটাকে নিজ হাতে ভেঙ্গে ফেলেন। অতঃপর তিনি সমস্ত ছবি-মূর্তি নিশ্চিহ্ন করে ফেলার নির্দেশ দেন এবং সাথে সাথে তা পালিত হয়।

অতঃপর তিনি কা'বা গৃহের দরজা বন্ধ করে দেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে কেবল উসামা ও বেলাল ছিলেন। এরপর তিনি দরজা বরাবর সম্মুখ দেওয়ালের তিন হাত পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেন।

মানছূরপুরী এই ছালাতকে শুকরিয়ার ছালাত বলেছেন।[২৮] কোন কোন বিদ্বান একে 'তাহিইয়াতুল মসজিদ' দু'রাক'আত ছালাত বলেছেন।[২৯] তবে ঐদিন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কা'বা গৃহের মধ্যে ছালাত আদায় করেছিলেন কি-না, এ নিয়ে বেলাল ও উসামাহ্র দু'ধরনের বক্তব্য থাকায় বিদ্বানগণ একমত হ'তে পারেননি। এটা নিশ্চিত যে, ঐ সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) 'মুহরিম' ছিলেন না এবং পরবর্তীতে বিদায় হজ্জের সময় তিনি কা'বার মধ্যে ছালাত আদায় করেননি। কেননা মাক্বামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে কা'বাকে সামনে রেখে ছালাত আদায়ের নির্দেশ রয়েছে কুরআনে। কিন্তু কা'বার ভিতরে গিয়ে ছালাত আদায়ের কথা নেই।[৩০] এ সময় তাঁর ডান পাশে একটি ও বাম পাশে দু'টি স্তম্ভ এবং পিছনে তিনটি স্তম্ভ ছিল। ঐ সময় কা'বা গৃহে মোট ৬টি স্তম্ভ ছিল। অতঃপর তিনি ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে দেখেন ও সর্বত্র *আল্লাহু আকবর* ও *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* পড়তে থাকেন। অতঃপর তিনি দরজা খুলে দেন। এ সময় হাযার হাযার লোক কা'বা গৃহের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল।

২৫. *যাদুল মা'আদ ৩/৩৫৬-৫৭।*
২৬. *যাদুল মা'আদ ৩/৩৫৭।*
২৭. *বুখারী হা/৪২৮৮।*
২৮. *রহমাতুল্লিল আলামীন ১/১১৯।*
২৯. *ফাৎহুল বারী ৩/৫৪৪, 'হজ্জ' অধ্যায়-২৫, অনুচ্ছেদ-৫১।*
৩০. *দ্রঃ ফাৎহুল বারী হা/১৫৯৮ ও ১৬০১ নং হাদীছ দ্বয়ের ব্যাখ্যা, 'হজ্জ' অধ্যায়, ৫১ ও ৫৪ অনুচ্ছেদ।*

রাসূলের ১ম দিনের ভাষণ :

অতঃপর তিনি দরজার দুই পাশ ধরে নীচে দণ্ডায়মান কুরায়েশদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। যেখানে তিনি বলেন, لآ إِلَه إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং সেনাদলকে একাই পরাভূত করেছেন'। শুনে রাখ, সম্মান ও সম্পদের সকল অহংকার এবং রক্তারক্তি আমার পদতলে নিষ্পেষিত হ'ল। কেবলমাত্র বায়তুল্লাহ্র চাবি সংরক্ষণ ও হাজীদের পানি পান করানোর (سِدَانَةُ البيت وسِقَايةُ الحاج) সম্মানটুকু ছাড়া (অর্থাৎ এ দু'টি দায়িত্ব তোমাদের জন্য বহাল রইল)। ভুলবশত হত্যা যা লাঠিসোটা দ্বারা হয়ে থাকে, তা ইচ্ছাকৃত হত্যার সমতুল্য (إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهُ الْعَمَدِ), তাকে পূর্ণ রক্তমূল্য (دية مغلظة) দিতে হবে একশ'টি উট। যার মধ্যে ৪০টি হবে গর্ভবতী।[৩১]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، فَالنَّاسُ رَجُلاَنِ : مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ–

'হে জনগণ! আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের অংশ ও পূর্ব পুরুষের অহংকার দূরীভূত করে দিয়েছেন। মানুষ দু'প্রকারের : মুমিন আল্লাহভীরু অথবা পাপাচারী হতভাগ্য। তোমরা আদম সন্তান। আর আদম ছিলেন মাটির তৈরী'। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ– 'হে মানবজাতি! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হ'তে সৃজন করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকটে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যিনি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সর্বকিছু খবর রাখেন' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।[৩২] অতঃপর বললেন, يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ مَا تَرَوْنَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ؟ 'হে কুরায়েশগণ! আমি তোমাদের সাথে কিরূপ আচরণ করব বলে তোমরা আশা কর'? সবাই বলে উঠল, خَيْرًا أَخٌ كَرِيمٌ وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ 'উত্তম আচরণ। আপনি দয়ালু ভাই ও দয়ালু ভাইয়ের পুত্র'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطُّلَقَاءُ 'শোন! আমি তোমাদের সেকথাই বলছি, যেকথা ইউসুফ তার ভাইদের বলেছিলেন, 'তোমাদের প্রতি আজ আর কোন অভিযোগ নেই' *(ইউসুফ ১২/৯২)*। যাও তোমরা সবাই মুক্ত'।[৩৩] বর্ণনাটির সনদ যঈফ হ'লেও মর্ম (Meaning) ছহীহ। কেননা ঐ দিন কাউকে বন্দী করা হয়নি বা গণীমত সংগ্রহ করা হয়নি। বরং সবাই মুক্ত ছিল এবং উপস্থিত সবাই বায়'আত নিয়ে ইসলাম কবুল করেছিল। তাছাড়া বর্ণনাটি খুবই প্রসিদ্ধ এবং প্রায় সকল জীবনীকার এটি বর্ণনা করেছেন।

কা'বা গৃহের চাবি :

ভাষণ শেষে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মসজিদুল হারামে বসে পড়লেন। এমন সময় চাবি হাতে নিয়ে হযরত আলী (রাঃ) এসে বললেন, হে রাসূল! اجْمَعْ لَنَا الْحِجَابَةَ مَعَ السِّقَايَةِ 'আমাদেরকে হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্বের সাথে সাথে কা'বার চাবি সংরক্ষণের দায়িত্বটাও অর্পণ করুন'। صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ 'আল্লাহ আপনার উপরে রহম করুন'। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, এই দাবীটি চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَيْنَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ ؟ 'ওছমান বিন তালহা কোথায়? অতঃপর তিনি এলে তাকে বললেন, هَاكَ مِفْتَاحَكَ يَا عُثْمَانُ الْيَوْمَ يَوْمُ بِرٍّ وَوَفَاءٍ 'এই নাও তোমার চাবি হে ওছমান! আজ হ'ল সদাচরণ ও ওয়াদা পূরণের দিন'।[৩৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একথাও বলেন, خُذُوهَا خَالِدَةً تَالِدَةً لاَ يَنْزِعُهَا مِنْكُمْ إِلاَّ ظَالِمٌ 'তোমরা এটা গ্রহণ কর চিরদিনের জন্য। তোমাদের কাছ থেকে কেউ এটা ছিনিয়ে নেবে না যালেম ব্যতীত। হে ওছমান! আল্লাহ তাঁর গৃহের জন্য তোমাদেরকে আমানতদার করেছেন فَكُلُوا مِمَّا يَصِلُ إِلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ بِالْمَعْرُوفِ 'অতএব এই গৃহ থেকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে যা তোমাদের কাছে আসবে, তা তোমরা ভক্ষণ করবে'।[৩৫]

উল্লেখ্য যে, জাহেলী যুগ থেকেই বনু হাশিমের উপরে এবং সে হিসাবে ইসলামী যুগের প্রাক্কালে হযরত আব্বাস-এর উপরে হাজীদের পানি পান করানোর এবং ওছমান বিন তালহার

৩১. *আবুদাউদ হা/৪৫৪৭ সনদ হাসান।*
৩২. *তিরমিযী হা/৩২৭০ সনদ ছহীহ; আবু দাউদ হা/৫১১৬; ঐ, মিশকাত হা/৪৮৯৯।*
৩৩. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৪১২; ফিক্বহুস সীরাহ ১/৩৮২; যঈফাহ হা/১১৬৩, সনদ যঈফ।*
৩৪. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৪১২; যঈফাহ হা/১১৬৩ যঈফ মুরসাল।*
৩৫. *যাদুল মা'আদ ৩/৩৬০।*

উপরে কা'বার চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ব ছিল। ওছমান বিন তালহা ৭ম হিজরীর ১ম দিকে মদীনায় গিয়ে ইসলাম কবুল করেন।

কা'বার ছাদে আযানের ধ্বনি :

যোহরের ওয়াক্ত সমাগত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেলালকে নির্দেশ দিলেন কা'বার ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দিতে। শুরু হ'ল বেলালের মনোহারিণী কণ্ঠের গুরুগম্ভীর আযান। শিরকী জাহেলিয়াত খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়লো তাওহীদ ও রিসালাতের গগনভেদী আওয়াযে। মক্কার পাহাড়ে ও উপত্যকায় সে আওয়ায ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে চলে গেল দূরে বহু দূরে। ছবি ও মূর্তিহীন কা'বা পুনরায় ইবরাহিমী যুগের আসল চেহারা ফিরে পেল। বেলালী কণ্ঠের এ আযান ধ্বনি যেন তাই খোদ কা'বারই কণ্ঠস্বর। মুমিনের হৃদয়ে তা এনে দিল এক অনাবিল আনন্দের মূর্চ্ছনা, এক অনুপম আবেগময় অনুভূতি। আড়াই হাযার বছর পূর্বে নির্মিত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের স্মৃতিধন্য কা'বার পাদদেশে মাক্বামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে ছালাতের ইমামতি করবেন ইসমাঈল- সন্তান মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। মক্কার অলিতে-গলিতে শুরু হ'ল এক অনির্বচনীয় আনন্দের ঢেউ। দলে দলে মুমিন নর-নারী ছুটলো কা'বার পানে। সে দৃশ্য কেবল মনের চোখেই দেখা যায়। লিখে প্রকাশ করা যায় না। কেবল হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়, মুখে বলা যায় না। কিন্তু শয়তান তখনও আশা ছাড়েনি।

সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ান বিন হারব এবং তার সাথী মুশরিক নেতা আত্তাব বিন আসীদ ও হারেছ বিন হেশাম- যারা এসময় কা'বার চত্বরে বসেছিলেন, এ আযান তাদের হৃদয়ে কোন রেখাপাত করেনি। জাহেলী যুগের কৌলিন্যের অহংকার তখনও তাদেরকে তাড়া করে ফিরছিল। তাদের অন্যতম নেতা উমাইয়া বিন খালাফের সাবেক ক্রীতদাস ও তার হাতে সে সময় মর্মান্তিকভাবে নির্যাতিত নিগ্রো যুবক বেলাল আজ মহাপবিত্র কা'বার ছাদে ওঠে দাঁড়িয়েছে, এটা তাদের কাছে ছিল নিতান্ত অসহনীয় বিষয়। কথায় কথায় আল্লাহ্র নাম নিলেও লাত ও ওয্যার এই সেবকদের নিকটে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র আযান ধ্বনি অত্যন্ত অপসন্দনীয় ঠেকলো। তাই আত্তাব বলে উঠলেন, (পিতা) আসীদকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন যে, তিনি এটা শুনেননি, যা তাঁকে ক্রুদ্ধ করত'। হারেছ বললেন, আল্লাহ্র কসম! যদি আমি জানতে পারি যে, ইনি সত্য, তাহ'লে অবশ্যই আমি তাঁর অনুসারী হয়ে যাব'। আবু সুফিয়ান বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি কিছুই বলব না। কেননা যদি আমি কিছু বলি তাহ'লে এই কংকরগুলিও আমার সম্পর্কে খবর দিয়ে দেবে'। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে উপস্থিত হ'লেন এবং বললেন, এইমাত্র তোমরা যেসব আলাপ করছিলে, তা আমাকে জানানো হয়েছে। অতঃপর তিনি সব বলে দিলেন। তখন হারেছ ও আত্তাব বলে উঠলেন, نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ– 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল'! আল্লাহ্র কসম! আমাদের নিকটে এমন কেউ ছিল না যে, সে গিয়ে আপনাকে বলে দিবে'।[৩৬]

উম্মে হানীর গৃহে ৮ রাক'আত নফল ছালাত আদায় :

মক্কা বিজয়ের দিন দুপুরের কিছু পূর্বে বিজয় সম্পন্ন হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আলীর বোন উম্মে হানীর গৃহে গমন করেন ও গোসল সেরে ৮ রাক'আত নফল ছালাত আদায় করেন। এই ছালাত সূর্য গরম হওয়ার সময় আদায়ের কারণে অনেকে একে 'ছালাতুয যুহা' বলেছেন। তবে ছফিউর রহমান মুবারকপুরী বলেন, وَإِنَّمَا هَذِهِ صَلاَةُ الْفَتْحِ، 'বস্তুতঃ এটি ছিল বিজয়োত্তর শুকরিয়ার ছালাত'। ইবনু কাছীর বলেন, এটি ছিল বিজয়োত্তর শুকরিয়ার ছালাত যা তিনি দুই দুই রাক'আত করে পড়েছিলেন। পরে এটিই রীতি হয়ে যায়, যেমন সা'দ ইবনু আবী ওয়াকক্বাছ মাদায়েন বিজয়ের দিন এটা পড়েন।[৩৭] এই সময় উম্মে হানীর ঘরে তার দু'জন দেবর আশ্রিত ছিল। হযরত আলী তাদের হত্যা করতে চেয়েছিলেন। উম্মে হানী তাদের জন্য রাসূলের নিকটে আশ্রয় চাইলে তিনি তাদের আশ্রয় দেন।

বড় বড় পাপীদের রক্ত অনর্থক ঘোষণা (إهدار دم رجال من أكابر المجرمين) :

মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বড় বড় পাপীদের মধ্যে নয় ব্যক্তির রক্ত অনর্থক সাব্যস্ত করেন এবং কঠোর নির্দেশ জারি করেন যে, এরা যদি কা'বার গেলাফের নীচেও আশ্রয় নেয়, তথাপি তাদের হত্যা করা হবে। (وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة) এই নয় জন ছিল- (১) আব্দুল উযযা বিন খাত্বাল (২-৩) তার দুই দাসী, যারা রাসূলকে ব্যঙ্গ করে গান গাইত (৪) সারাহ- যে আব্দুল মুত্ত্বালিবের সন্তানদের কারু দাসী ছিল। এই দাসীই মদীনা থেকে গোপনে হাতেব বিন আবী বালতা'আহ্র পত্র বহন করেছিল। (৫) ইকরিমা বিন আবু জাহল (৬) আব্দুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবী সারাহ (৭) হারেছ বিন নুফাইল বিন ওয়াহাব (৮) মিক্বইয়াস বিন হুবাবাহ (مقيس بن حبابة) (৯) হোবার ইবনুল আসওয়াদ (هبار بن الأسود)। পরে এদের মধ্যে চারজনকে হত্যা করা হয় এবং পাঁচ জনকে ক্ষমা করা হয়। তারা সবাই ইসলাম কবুল করেন।

---

৩৬. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৪১৩।*
৩৭. *তাফসীর সূরা নছর ৮/৪৮২।*

যাদেরকে হত্যা করা হয়, তারা হ'ল- (১) আব্দুল উযযা ইবনু খাত্বাল। সে কা'বা গৃহের গেলাফ ধরে ঝুলছিল। জনৈক ছাহাবী এখবর দিলে রাসূল (ছাঃ) তাকে হত্যার নির্দেশ দেন।

(২) মিক্বয়াস বিন হুবাবাহ। এ ব্যক্তি ইতিপূর্বে মুসলমান হয়ে জনৈক আনছার ছাহাবীকে হত্যা করে মুরতাদ হয়ে মুশরিকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। নুমায়লা বিন আব্দুল্লাহ তাকে হত্যা করেন।

(৩) হুওয়াইরিছ বিন নুক্বাইয বিন ওয়াহাব। এ ব্যক্তি মক্কায় রাসূলকে কঠিনভাবে কষ্ট দিত। এ ব্যক্তি মক্কা থেকে মদীনায় প্রেরণের সময় রাসূল-কন্যা হযরত ফাতেমা ও উম্মে কুলছূমকে তীর মেরে উটের পিঠ থেকে ফেলে দিয়েছিল।[৩৮] হযরত আলী তাকে হত্যা করেন।

(৪) ইবনু খাত্বালের দুই দাসীর মধ্যে একজন।

অতঃপর ক্ষমাপ্রাপ্ত পাঁচজন হ'লেন : (১) আব্দুল্লাহ ইবনু আবী সারাহ সে ইতিপূর্বে একবার ইসলাম কবুল করে মুরতাদ হয়ে যায়। মক্কা বিজয়ের দিন হযরত ওছমান তাকে সাথে নিয়ে রাসূলের দরবারে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। পরে তার ইসলাম খুবই ভাল ছিল। (২) ইকরিমা বিন আবু জাহল। তার স্ত্রী এসে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাকে আশ্রয় দেওয়া হয়। পরে ইয়ামনের পথে পলায়নরত ইকরিমাকে স্ত্রী গিয়ে নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে তার ইসলাম খুবই ভাল ছিল। (৩) হোবার ইবনুল আসওয়াদ। এ ব্যক্তি রাসূলের গর্ভবতী কন্যা যয়নবকে হিজরতের সময় তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছিল। যাতে তিনি আহত হয়ে উটের পিঠের হাওদা থেকে নীচে পাথরের উপরে পতিত হন এবং তাঁর গর্ভপাত হয়ে যায়। মক্কা বিজয়ের দিন এই ব্যক্তি পালিয়ে যায়। পরে মুসলমান হয় এবং তার ইসলাম সুন্দর ছিল। (৪) ইবনু খাত্বালের দুই গায়িকা দাসীর মধ্যে একজনের জন্য আশ্রয় চাওয়া হয়। অতঃপর সে ইসলাম কবুল করে। (৫) সারাহর জন্যও আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় এবং সেও ইসলাম কবুল করে।[৩৯]

এদিকে মক্কার অন্যতম নেতা ছাফওয়ান বিন উমাইয়ার রক্ত বৃথা সাব্যস্ত করা না হ'লেও তিনি পালিয়ে যান। ওমায়ের বিন ওয়াহাব আল-জামহী তার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করলে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তা মঞ্জুর করেন এবং তাকে আশ্রয় দানের প্রতীক স্বরূপ নিজের পাগড়ী প্রদান করেন, যে পাগড়ী পরে তিনি বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। অতঃপর ওমায়ের যখন ছাফওয়ানের নিকটে পৌঁছেন, তখন তিনি জেদ্দা হ'তে ইয়ামন যাওয়ার জন্য জাহাযে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ওমায়ের তাকে ফিরিয়ে আনেন। তিনি এসে রাসূলের নিকট দু'মাস সময়ের আবেদন করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে চার মাস সময় দেন। অতঃপর ছাফওয়ান ইসলাম কবুল করেন। তার স্ত্রী পূর্বেই ইসলাম কবুল করেছিলেন। ফলে তাদের মধ্যে বিবাহ বহাল রাখা হয়।[৪০]

উল্লেখ্য যে, বর্ণিত ৯ জনের তালিকা ছাড়াও অন্য কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। ফলে সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪ জন। যার মধ্যে ৮ জন পুরুষ ও ৬ জন নারী।[৪১] যাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়জনের অন্যতম ছিলেন আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে ওৎবা। যিনি মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হন। অন্যজন হ'লেন হামযাহ (রাঃ)-এর হত্যাকারী ওয়াহশী বিন হারব, যিনি পরে মদীনায় গিয়ে ইসলাম কবুল করেন। অন্যজন হ'লেন বিখ্যাত কবি কা'ব বিন যুহায়ের, যিনি পরে রাসূলের নামে প্রশংসা মূলক কবিতা লিখে মদীনায় গিয়ে ইসলাম কবুল করেন। রাসূল (ছাঃ) খুশী হয়ে তাকে নিজের চাদর উপহার দেন বলে উক্ত কবিতাটি 'ক্বাছীদা বুরদাহ' নামে পরিচিতি লাভ করে।

(ক্রমশঃ)

৩৮. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৪১০।*
৩৯. *এ সম্পর্কে বিস্তরিত আলোচনা নাসাঈ হা/৪০৬৭, সনদ ছহীহ; মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৩১৮০; মুওয়াত্ত্বা মুরসাল সনদে।*
৪০. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৪১৮; আর-রাহীক্ব ৪০৭; মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৩১৮০।*
৪১. *আর-রাহীক্ব ৪০৭।*

ওয়াহ্হাবী আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; মুসলিম বিশ্বে এর প্রভাব

*আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব**

(৪র্থ কিস্তি)

ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের রাজনৈতিক পথপরিক্রমা :

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের সংস্কার আন্দোলন কেবল নজদবাসীর আক্বীদা ও আমল-আখলাকেরই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেনি; বরং নজদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনেও আমূল পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। যার প্রত্যক্ষ ভূমিকায় যেমন ছিলেন তাঁর অনুসারী আলেম-ওলামা এবং ছাত্র-মুবাল্লিগবৃন্দ, তেমনি দ্বীনের যোগ্য মুজাহিদ হিসাবে অগ্রবর্তী তালিকায় ছিলেন ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ (১৭২৬-১৭৬৫ খৃঃ) ও তাঁর পরবর্তী বংশধরগণ। ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের সাথে এই পরিবারের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক যুথবদ্ধতা[৪২] এ আন্দোলন প্রসারে যে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষতঃ শায়খের মৃত্যুর পর ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের পরবর্তী ইতিহাস এই পরিবারকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। ফলে অনিবার্যভাবেই ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের বিস্তারের ধারাবাহিকতা পর্যালোচনায় 'সঊদী আরব' নামক রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠা লাভের ইতিহাস এসে যায়। যার প্রতিটি শিরা-উপশিরায় বেগবান শোণিতধারার মত মিশে আছে ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের আদর্শিক বিপ্লবের তপ্ত মন্ত্র।[৪৩] নিম্নে এই ইতিহাসকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করে আলোচনা করা হল।

১ম সঊদী আরব রাষ্ট্র (১৭৪৪-১৮১৮ খৃঃ/১১৫৭-১২৩৪হিঃ) :

নজদে সঊদ বংশের উত্থানের পূর্বে আরব উপদ্বীপ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল। পশ্চিম আরবে লোহিত সাগরের পূর্বাঞ্চল জুড়ে ছিল মক্কাকেন্দ্রিক শরীফদের[৪৪] শাসনভুক্ত স্বাধীন অঞ্চল হেজায। মধ্য আরবে ছিল আলে সঊদ, দাহ্হাম বিন দাওয়াস, বনু যায়েদ প্রভৃতি গোত্রভিত্তিক শাসকদের অধিকারভুক্ত তিনটি নগরী দিরঈইয়া, উয়ায়না ও হুফূফসহ বৃহত্তর নজদ অঞ্চল। আর পূর্বে আরব সাগরের বিস্তীর্ণ অববাহিকা জুড়ে ছিল ওছমানীয় সালতানাতের অনুগত যামেল আল-জাবারী বংশ ও বনু খালেদ বংশের শাসনাধীন উর্বর ফসলী অঞ্চল আল-আহসা।[৪৫] ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে নজদের ছোট্ট নগরী দিরঈইয়াতে মুহাম্মাদ বিন সঊদের ক্ষমতারোহনের মাধ্যমে আরবের সবচেয়ে প্রভাবশালী বংশ হিসাবে আবির্ভাব ঘটে সঊদ বংশের। যার পিছনে একমাত্র অনুঘটক হিসাবে কাজ করছিল ওয়াহ্হাবী আন্দোলন। অনধিক ৭৫ বছরের মধ্যে এ আন্দোলনের অনুসারীরা সমগ্র আরবভূমিকে নিজেদের করায়ত্ত করতে সক্ষম হয় এবং অহির বিশুদ্ধ দাওয়াতকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। এজন্য ১ম সঊদী আরবকে ইতিহাসে 'ওয়াহ্হাবী রাষ্ট্র' হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। নিম্নে সঊদ বংশের উত্থান ও ১ম সঊদী আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচিত হল।

মুহাম্মাদ বিন সঊদ (১৭২৬-১৭৬৫ খৃঃ):

১৭২৬ খৃষ্টাব্দে নজদের দিরঈইয়া নগরীর অধিকর্তা নিযুক্ত হন সঊদ বংশের কৃতি সন্তান মুহাম্মাদ বিন সঊদ বিন মুক্বরিন। যাকে বর্তমান সঊদী আরবের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে মর্যাদা দেয়া হয়। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের সাথে ইমাম মুহাম্মাদের ঐতিহাসিক সন্ধি পরবর্তীতে আরব উপদ্বীপে বৃহত্তর সঊদী আরব রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি রচনা করে। অপরপক্ষে তাঁর ঐকান্তিক সহযোগিতায় মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবও নির্বিঘ্নে নির্ভেজাল তাওহীদ ও সুন্নাতের দাওয়াতকে প্রথমে নজদ এবং পরবর্তীতে সমগ্র সঊদী আরবসহ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। শায়খের দাওয়াত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্র দিরঈইয়ার পরিচিতি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দিন দিন তা রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফলে শীঘ্রই পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলো দিরঈইয়ার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয় তাওহীদ ও সুন্নাতের উপর ভিত্তিশীল এবং 'ইমাম' লকবধারী শাসকের অধীনে পরিচালিত রাষ্ট্রটির আবির্ভাব নজদসহ সমগ্র সঊদী আরব জুড়ে শাসকদের টনক নড়িয়ে দেয়।[৪৬] ১৭৪৯ সালে ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ হেজাযের আলেম-ওলামার সাথে মতবিনিময়ের জন্য মুবাল্লিগদের একটি প্রতিনিধিদলকে মক্কায় প্রেরণ করেন। কিন্তু সেখানকার আলেমগণ তাদের সাথে খুব খারাপ আচরণ করেন এবং তাদের অধিকাংশকেই কারাবন্দী করা হয়।[৪৭] এমনকি পরবর্তীতে বিশেষ অনুমতি ব্যতীত নজদবাসীদের জন্য হজ্জ আদায়ও নিষিদ্ধ করা হয়।[৪৮] যাইহোক ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের উত্থান পর্বে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ। ইসলামের বিশুদ্ধ দাওয়াতকে ছড়িয়ে

---

* এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৪২. এমনকি এ সম্পর্ক পারিবারিক সম্পর্কে পরিণত হয়েছিল বলে কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে, ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদের সাথে শায়খের এক কন্যার বিবাহ হয়। যদিও বিষয়টি হুসায়েন বিন গান্নাম বা ইবনে বিশর উল্লেখ করেননি বলে এর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে। দ্রঃ *মাস'ঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১।*

৪৩. James Wynbrant, A brief history of Saudi Arabia (New York : Facts on file. inc, 2004), P. 119.

৪৪. মক্কা-মদীনা তথা হেজাযের শাসকদের উপাধি ছিল 'শরীফ'। আরবে মূলতঃ রাসূল (ছাঃ)-এর বংশধর তথা বনু হাশেমের বংশধরদের চিহ্নিত করার জন্য উপাধিটি ব্যবহৃত হ'ত। ১২০১ খৃষ্টাব্দে আব্বাসীয় শাসনামলে বনু হাশিমের জনৈক উত্তরাধিকারী শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে 'শরীফ' উপাধি ধারণ করেন। হাসান বিন আলী (রাঃ)-এর বংশধারা থেকে আগত এই শরীফের মাধ্যমেই শরীফী শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে হেজাযে। তখন থেকে তাঁর বংশধরগণ মক্কা-মদীনার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিরবচ্ছিন্নভাবে পালন করে এসেছে। স্থানীয়ভাবে এই শরীফরা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করলেও মুসলিম সালতানাতের ক্ষমতাসীন শাসকদের আনুগত্যে থেকেই তাঁরা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। আব্বাসীয়, আইয়ূবী ও মামলূক শাসকদের পর তারা যথারীতি ওছমানীয় সালতানাতেরও আনুগত্য স্বীকার করে নেন। ১৯০৮ সালে হোসেন (রাঃ)-এর বংশধরের সর্বশেষ 'শরীফ' আলী আব্দুল্লাহ পাশা ক্ষমতাচ্যুত হন। অতঃপর হোসাইন (রাঃ)-এর বংশধর থেকে পরপর কয়েকজন শরীফ ক্ষমতায় আসেন। ১৯২৫ সালে সর্বশেষ শরীফ আলী বিন হুসাইনের পতনের মাধ্যমে হেজাযে শরীফী শাসনের অবসান ঘটে *(উইকিপিডিয়া)*।

৪৫. James Wynbrant, Ibid, P. 104-106; উইকিপিডিয়া।

৪৬. আব্দুল্লাহ ছালেহ আল-উছায়মীন, বুহুছ ওয়া তা'লীক্বাত ফি তারীখিল মামলাকাহ আল-আরাবিয়াহ আস-সঊদিয়াহ (রিয়াদ : মাকতাবাতুত তাওবাহ, ২য় প্রকাশ : ১৯৯০ ইং), পৃঃ ২২-২৫।

৪৭. ইবনু বিশর, প্রাগুক্ত, ১/৫৯ পৃঃ, মাস'ঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, ৯২ পৃঃ।

৪৮. মাস'ঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২।

দেয়াই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। তাঁর মহত্ত্বের প্রশংসা জনগণের মুখে মুখে ছড়িয়ে ছিল।[৪৯] ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে এই মুজাহিদ শাসক সঊদী রাষ্ট্রের উত্থান পর্বের মাঝামাঝি সময় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আব্দুল আযীয বিন সঊদ (১৭৬৫-১৮০৩ খৃঃ) :

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদের মৃত্যুর পর দিরঈইয়ার শাসনভার গ্রহণ করেন তদীয় পুত্র আব্দুল আযীয। দায়িত্ব নিয়েই তিনি ওয়াহ্হাবী রাষ্ট্রটির সীমানা বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৭৭৩ সালে তিনি দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে চলমান যুদ্ধে রিয়াদের শাসক দাহ্হাম বিন দাওয়াসকে পরাজিত করে রিয়াদ দখল করেন। এই বিজয় ওয়াহ্হাবীদের জন্য আরব উপদ্বীপের অন্যান্য অঞ্চলসমূহের দিকে নজর দেয়ার সুযোগ করে দেয়। ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই নজদের সৈন্যরা বড় বড় অভিযান পরিচালনা করা শুরু করল এবং নতুন নতুন স্থান বিজিত হতে লাগল।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে হেজাযের শরীফের একটি কাফেলার সাথে ওয়াহ্হাবীদের সংঘর্ষ বাঁধে এবং কাফেলার নেতা মানছূরকে বন্দী করা হয়। ইমাম আব্দুল আযীয তাকে কোনরূপ মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দিলে শরীফদের সাথে ওয়াহ্হাবীদের দীর্ঘদিনের শীতল সম্পর্কের বরফ গলা শুরু হয়।[৫০] সেই সূত্রে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ইমাম আব্দুল আযীয তৎকালীন শরীফের জন্য উপঢৌকনসহ মক্কায় একটি বিশেষ মুবাল্লিগদল প্রেরণ করেন। তারা মক্কার মাযহাবপন্থী ওলামাদের বুঝাতে সক্ষম হন যে, ওয়াহ্হাবীদের আক্বীদা-আমল আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আত থেকে পৃথক নয়; বরং তা পুরোপুরি কুরআন ও সুন্নাহ্র উপর ভিত্তিশীল।[৫১] কিন্তু তারপরও অচলাবস্থা কাটল না। অতঃপর ১৭৯০ সালে নতুন শরীফ গালিব বিন মুসাঈদ ওয়াহ্হাবীদের সাথে সম্পর্কোন্নয়ন ঘটাতে চাইলেন। তাঁর আগ্রহের প্রেক্ষিতে ইমাম আব্দুল আযীয শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের একটি চিঠিসহ আব্দুল আযীয বিন হুসাইনকে মক্কায় প্রেরণ করলেন। শরীফ তাঁর সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর খুব সন্তুষ্ট হন এবং ওয়াহ্হাবী দাওয়াতের দলীল-প্রমাণের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন। কিন্তু মক্কার আলেমগণ ওয়াহ্হাবীদের সাথে শরীফের এই সমঝোতার সম্ভাবনা লক্ষ্য করে আতংকিত হয়ে উঠলেন এবং শরীফকে এই বলে প্ররোচনা দিলেন যে, هؤلاء الجماعة ليس عندهم بضاعة إلا إزالة نهج آبائك وأجدادك ورفع يدك عما يصل إليك من خير بلادك. 'এই দলটির একমাত্র উদ্দেশ্য আপনাকে আপনার পূর্বপুরুষদের পথ থেকে বিচ্যুত করা এবং আপনার রাষ্ট্রক্ষমতা হাতছাড়া করানো।' স্বভাবতই তাদের এই প্ররোচনায় শরীফ বিভ্রান্ত হলেন। ফলে সন্ধি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল এবং ওয়াহ্হাবীদের সাথে শরীফদের বৈরিতার সম্পর্ক অব্যাহত রইল।[৫২] পরের বছর ১৭৯২ সালে ৮৯ বছর বয়সে ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব মৃত্যুবরণ করলেন এবং তাঁর ভাই সুলায়মান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। ততদিনে ওয়াহ্হাবী আন্দোলন আরবের বুকে সুদৃঢ় ভিত্তি লাভ করেছে। ফলে শায়খের মৃত্যুতে তাঁর আন্দোলন মোটেই বাধাগ্রস্ত বা স্তিমিত হয়নি।[৫৩]

রিয়াদ বিজয়ের পর ইমাম আব্দুল আযীয পূর্বাঞ্চল তথা আল-আহসার শক্তিশালী বনু খালেদ বংশের শাসকের নিকট ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের দাওয়াত পৌঁছে দেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং এ আন্দোলনকে প্রতিরোধ করার জন্য সুযোগমত ওয়াহ্হাবীদের উপর আক্রমণ চালাতে থাকেন। অবশেষে দীর্ঘ কয়েক বছরের প্রতিরোধ যুদ্ধের পর ১৭৯৩ সালে আল-আহসা অঞ্চল পুরোপুরিভাবে ওয়াহ্হাবীদের দখলে চলে আসে। সেখানে প্রচলিত কবর ও মাযারকেন্দ্রিক যাবতীয় শিরক ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াযের অবসান ঘটানো হয়।[৫৪] অতঃপর উপসাগরীয় অঞ্চল কুয়েত, বাহরায়েন, কাতার থেকে ওমান পর্যন্ত এক বিস্তৃত ভূখণ্ড ওয়াহ্হাবীদের দখলে আসে। এভাবে সালাফী দাওয়াত ক্রমেই ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে যেতে থাকল। এদিকে সম্পর্কোন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর মক্কার শরীফ গালিব বিন মুসাঈদ ওয়াহ্হাবীদেরকে সশস্ত্রভাবে মুকাবিলার পরিকল্পনা নেন।[৫৫] প্রথমদিকে তার বাহিনী ওয়াহ্হাবীদের মিত্র গোত্রসমূহের উপর চোরাগোপ্তা হামলা শুরু করে।[৫৬] অতঃপর ১৭৯৭ সালে তিনি ওয়াহ্হাবীদের বিরুদ্ধে এক বড় যুদ্ধে পরাজিত হন এবং সন্ধি করতে বাধ্য হন। চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষের রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্ধারিত হল এবং নজদবাসীদের জন্য আরোপিত হজ্জ আদায়ের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হল। ফলে দীর্ঘ কয়েক যুগ পর ১৮০০ সালে সঊদ বিন আব্দুল আযীযের নেতৃত্বে ওয়াহ্হাবীরা নজদ ও আল-আহসা অঞ্চলের হাজীদের এক বিরাট কাফেলা নিয়ে মক্কায় আগমন করেন এবং আবার নিরাপদেই দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরের বছর ইমাম আব্দুল আযীযও বিরাট কাফেলা নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন। এর মাধ্যমে ওয়াহ্হাবীদের ব্যাপারে স্থানীয় অধিবাসীদের ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়ে যায় এবং এক প্রকার হৃদ্যতার সম্পর্ক তৈরী হয়।[৫৭]

---

৪৯. ইবনু বিশর, প্রাগুক্ত, ১/৯৯ পৃঃ, হায়কাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯-৭১।
৫০. মাস'ঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪।
৫১. ঐ, পৃঃ ৯৫।
৫২. ইবনে গান্নাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৩-৭৫।
৫৩. James Wynbrant, Ibid, P. 132.
৫৪. ইবনে গান্নাম, প্রাগুক্ত, ১৭২ পৃঃ; ইবনে বিশর, প্রাগুক্ত, ১/২০২ পৃঃ; সম্পাদনা পরিষদ, আল মাওসূ'আতুল আরাবিয়াহ আল-আলামিয়াহ *(রিয়াদ : www. intaaj.net থেকে প্রকাশিত ই-বুক, ১৪২৫ হিঃ/২০০৪ইং)*, নিবন্ধ শিরোনাম : 'আদ-দাওলাহ আস-সঊদিয়াহ আল ঊলা'।
৫৫. John Lewis Burchhardt, Notes on Bedouins and Wahabys (London : Henry Colburn and Richard Bentley, 1830) P. 322. (সুইস পর্যটক John Lewis Burchhardt ছিলেন মিসরের খেদিভ মুহাম্মাদ আলী পাশার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মুহাম্মাদ আলী পাশা মক্কায় অবস্থানকালে তিনি ১৮১৪ সালের আগস্ট মাসে হেজাযে আগমন করেন এবং ১৮১৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় বছরখানেক আরব ভূখণ্ডে পরিভ্রমণ করে সেখানকার সমাজ ও রাজনীতির উপর ৪৩৯ পৃষ্ঠার একটি মূল্যবান ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা করেন। আরব ঐতিহাসিক ইবনে গান্নাম ও ইবনে বিশরের গ্রন্থদ্বয়ের বাইরে এই গ্রন্থটিও ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের উপর রচিত একটি বিশ্বস্ত দলীল হিসাবে বিবেচিত হয়)।
৫৬. আল-মাওসূ'আতুল আরাবিয়াহ আল-আলামিয়াহ।
৫৭. ইবনে বিশর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৪; মাস'ঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪।

১৮০২ সালে এক ওয়াহ্হাবী কাফেলার উপর একটি শী'আ গোত্র হামলা চালায়। এরই জের ধরে সঊদ বিন আব্দুল আযীযের নেতৃত্বে ওয়াহ্হাবীরা দক্ষিণ ইরাকের কারবালা নগরীতে এক দুঃসাহসিক অভিযান চালায় এবং হোসায়েন (রাঃ)-এর মাযারসহ কারবালার সকল কবর-মাযার-গম্বুজ সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দেয়।[৫৮] এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ওছমানীয় সুলতান তৎক্ষণাৎ ইরাকের শাসক ইবরাহীম পাশাকে সঊদী বাহিনীর উপর আক্রমণ পরিচালনার নির্দেশ দেন। কিন্তু ইরাকী বাহিনী কুর্দী বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায় এদিকে আর নযর দিতে পারেনি।[৫৯]

এদিকে মক্কার শরীফের সাথে কৃত সন্ধিচুক্তি বেশীদিন বলবৎ রইল না। শরীফ গালিব সঊদী বাহিনীর প্রতি চুক্তি ভঙ্গ ও শত্রুতামূলক কার্যকলাপের অভিযোগ তুললেন এবং সমঝোতার জন্য স্বীয় উযীর ওছমান আল-মুযায়েফীকে নজদে পাঠালেন। কিন্তু উযীর ওছমান সঊদী বাহিনীর সাথে সাক্ষাত করার পর ওয়াহ্হাবীদেরই পক্ষাবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেন। এমনকি মক্কায় ফিরে এসে ওয়াহ্হাবীদের পক্ষ থেকে নিজেই শরীফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। একই সময়ে শরীফ গালিবের সাথে তার ভাই আব্দুল মঈনের সম্পর্ক খারাপ যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে ত্বায়েফের নিকটে এক সংঘর্ষও বাঁধে। যেখানে শরীফ গালিব পরাজিত হন। এই সুযোগে ১৮০৩ সালে সঊদী বাহিনী ত্বায়েফ দখল করে নেয় এবং চারিদিক থেকে মক্কা নগরীর দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর হজ্জের মৌসুম শেষে ১২১৮ হিজরীর ৮ই মুহাররম মোতাবেক ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল শনিবার সঊদ বিন আব্দুল আযীযের নেতৃত্বে সঊদী বাহিনী বিজয়ীর বেশে মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করেন।[৬০] শরীফ গালিব আগেই মক্কা ছেড়ে জেদ্দায় পালিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে বিনা বাধায় ওয়াহ্হাবী বাহিনী মক্কা মুকাররামা দখল করে। গালিবের স্থলাভিষিক্ত শরীফ আব্দুল মঈন মক্কার শরীফ হিসাবে দায়িত্ব পালন করে যাবেন–এই শর্তসাপেক্ষে সঊদ বিন আব্দুল আযীযের আনুগত্য স্বীকার করে নেন। অতঃপর সঊদ বিন আব্দুল আযীয মক্কার মসজিদে হারামের মিম্বরে দাঁড়িয়ে অধিবাসীদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তাদানের ঘোষণা দিয়ে বললেন–'আপনারা হলেন বায়তুল্লাহ্র প্রতিবেশী, হারামের অধিবাসী, হারামের নিরাপত্তায় নিরাপত্তাপ্রাপ্ত জনগণ। আপনাদেরকে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আপনি বলুন! হে আহলে কিতাবগণ এস সেই কথার দিকে যা আমাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝে সমান; তা এই যে, 'আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করব না, আর আমরা একে অপরকে আল্লাহ্র পরিবর্তে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করব না। এরপরও যদি তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো, তাহলে তোমরা বল, তোমরাই সাক্ষী যে আমরা মুসলিম।' তোমরা আজ আল্লাহ, আমীরুল মুসলিমীন সঊদ বিন আব্দুল আযীয এবং তোমাদের ইমাম আব্দুল মুঈনের মুখোমুখি দণ্ডায়মান। অতএব তোমরা তোমাদের শাসকের কথা শ্রবণ কর এবং তাঁর আনুগত্য কর, যতক্ষণ তিনি আল্লাহ্র আনুগত্যে থাকেন'।[৬১]

মক্কা মুকাররামায় এক তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণে তিনি জনগণের সামনে সংস্কারপন্থী সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি ও কর্মসূচীগুলো ব্যাখ্যা করেন এবং কবরের উপর প্রতিষ্ঠিত গম্বুজগুলো উৎসাদনের আহ্বান জানান। তাছাড়া মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব রচিত 'কাশফুশ শুবহাত' বইটি মসজিদে হারামের ইলমী হালকাসমূহে আলেম-ওলামা ও সাধারণ জনগণের উপস্থিতিতে পঠন-পাঠনের নির্দেশ দেন।[৬২]

অতঃপর তিনি তুর্কী সুলতান ৩য় সেলিমের নিকট পত্র লিখলেন–'আমি মক্কা শহরে প্রবেশ করেছি এবং পৌত্তলিকতার চিহ্নবাহী সবকিছু ধ্বংস ও অনাবশ্যক সকল প্রকার কর রহিত করত: এখানকার অধিবাসীদের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি। আপনার নিযুক্ত বিচারককে ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছি। অতএব আপনি দামেশক ও কায়রোর গভর্ণরদের এই পবিত্র শহরে ঢাক-ঢোল-ঝুমুর নিয়ে আসতে নিষেধ করে দিন। কেননা এতে দ্বীনের কোন অংশ নেই'।[৬৩]

ইবনে বিশর বর্ণনা করেন, 'মক্কার সর্বত্র তখন শিরকের জয়জয়কার ছিল। সঊদী বাহিনী ২০ দিনের মত মক্কায় অবস্থান করে এবং সকল কবরের উপর থেকে গম্বুজগুলো ধ্বংস করে দেয়। ফলে মক্কার বুকে কবর-মাযারকেন্দ্রিক শিরকের এমন একটি নিদর্শনও অবশিষ্ট রইল না যা নিশ্চিহ্ন করে ধূলায় মিশিয়ে দেয়া হয়নি'।[৬৪]

ফিলবী (Philby) বলেন, ইমাম সঊদ শরীফ আব্দুল মঈনের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেই মাসজিদুল হারামকে পৌত্তলিকতার আবর্জনা থেকে পরিষ্কার করার কাজে মনোযোগ দিলেন। কা'বার ভিতর থেকে উদ্ধারকৃত ধন-সম্পদ ও সোনা-দানা তিনি মানুষের মাঝে বিতরণ করে দিলেন ও কবরের উপর নির্মিত সকল গম্বুজ ধ্বংস করলেন।[৬৫]

T.P. Huges বলেন, মক্কা অধিকারের পর এই সংস্কার আন্দোলনের মূলনীতিগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করা হল। মাদকদ্রব্য, পারসিক চুরুট, তাসবীহ-তাবীয, সিল্কের তৈরী পোষাকাদি প্রভৃতি যাবতীয় শরী'আতবিরোধী বস্তুসমূহ জনগণের কাছ থেকে সংগ্রহ করে পুড়িয়ে দেয়া হল। মসজিদগুলো এমনভাবে আবাদ করা হল যে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে শহরের কোন লোককে অনুপস্থিত পাওয়া যেত না। ফলে ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি ও ইবাদতের এমনই পবিত্র দৃশ্য

---

৫৮. ইবনে বিশর, প্রাগুক্ত, ১/২৫৭-৫৮ পৃঃ; ওয়াহ্হাবীদের এই আক্রমণে দুই হাযারের বেশী শী'আ নিহত হয় এবং ধন-সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজে এবং বিশেষতঃ ইরানী শী'আদের মধ্যে ওয়াহ্হাবীবিরোধী এক প্রবল সেন্টিমেন্ট তৈরী হয়। দ্রঃ মাস'ঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬।

৫৯. মাস'ঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬-৭; আল-মাওসূ'আতুল আরাবিয়াহ আল-আলামিয়াহ।

৬০. ইবনে বিশর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৯-৬১; মাস'ঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৮।

৬১. আল-মাওসূ'আতুল আরাবিয়াহ আল-আলামিয়াহ।

৬২. প্রাগুক্ত।

৬৩. প্রাগুক্ত।

৬৪. ইবনে বিশর, প্রাগুক্ত, ১/২৬৩ পৃঃ; মাস'ঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯।

৬৫. মাস'ঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯।

পরিস্ফুট হল এই নিরাপদ শহরে, যার নযীর স্বর্ণযুগের পর আর কখনো দেখা যায়নি।[৬৬]

অনুরূপভাবে পর্যটক বারখারট (Burchhardt) তাঁর আরব ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখেছেন, মক্কার অধিবাসীরা আজও পর্যন্ত ইমাম সঊদের নাম কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সাথে স্মরণ করেন। এখনও পর্যন্ত তাঁর পবিত্র বাহিনীর পদক্ষেপসমূহ বিশেষতঃ হজ্জ ও যিয়ারতের সময়কালে তাদের খেদমতের কথা সর্বত্র প্রশংসার সাথে উচ্চারিত হয়। যে ন্যায়ানুগ আচরণ তারা সেদিন প্রদর্শন করেছিলেন তা মক্কাবাসী আজও ভুলেনি।[৬৭]

মক্কা বিজয়ের পর সঊদী বাহিনী জেদ্দা নগরীও অবরোধ করে। কিন্তু নানা প্রতিকূলতায় তারা দিরঈইয়ায় ফিরে যেতে বাধ্য হন। এই সুযোগে শরীফ গালিব পুনরায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সঊদী দখল থেকে মক্কা পুনরুদ্ধার করেন।[৬৮]

ঠিক ঐ সময়ই সঊদী আরবের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আব্দুল আযীয মসজিদে আছরের ছালাতে সিজদারত অবস্থায় জনৈক শী'আ অথবা কুর্দী আততায়ীর বর্শার আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন।[৬৯]

ইমাম আব্দুল আযীয ছিলেন এক আকর্ষণীয় প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব। পিতার মত তিনিও ছিলেন দ্বীনদার এবং আলেম হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ। এক ক্ষুদ্র গোত্রপতি হিসাবে যার যাত্রা শুরু হয়েছিল, স্বীয় নেতৃত্বগুণে একসময় তিনিই সমগ্র আরবের এক প্রতাপশালী অধিপতিতে পরিণত হন।[৭০] শুধু তাই নয় দীর্ঘ প্রায় ৩৯ বছরের শাসনামলে তিনি আরবের বুকে এমন এক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন, যা ছিল পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর উপর সুদৃঢ়ভাবে ভিত্তিশীল। খুলাফায়ে রাশেদার পর এমন ন্যায়বিচারপূর্ণ শাসনব্যবস্থা আর কখনো পরিদৃষ্ট হয়নি। তিনি কেবল আপোষহীন রাষ্ট্রনায়কই ছিলেন না; বরং শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের নিবিড় সাহচর্যে তিনি পরিণত হয়েছিলেন তাওহীদ ও সুন্নাতের একজন প্রজ্ঞাবান দাঈ ইলাল্লাহ। তাই যখনই কোন নতুন অঞ্চল বিজিত হ'ত তাঁর প্রথম কাজ ছিল সেখানে মুবাল্লিগ এবং দাঈ প্রেরণ করা। তাঁর অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টার বরকতে শিরক ও বিদ'আতের আস্তাকুড়ে পরিণত হওয়া সমগ্র আরব আবারও তাওহীদের আলোকচ্ছটায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে।[৭১] তাঁর সমসাময়িক ইমাম শাওকানী তাই তাঁর প্রশংসায় লিখেছেন, প্রায় সমগ্র হেজাযের অধিবাসী ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর হাতে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করল এবং শরী'আতের নির্দেশাবলী পালনে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। এমন এক সময়ে এটা ঘটেছিল যখন তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানত না কেবল বক্র উচ্চারণে কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করা ব্যতীত। এই চরম জাহেলিয়াতের মধ্য থেকেই উঠে এসে তারা সময়মত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতসহ ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান যথার্থভাবে পালনকারীতে পরিণত হল'।[৭২] *ফালিল্লাহিল হামদ*।

সঊদ বিন আব্দুল আযীয (১৮০৩-১৮১৪ খৃঃ) :

ইমাম আব্দুল আযীযের মৃত্যুর পর জেষ্ঠ্য পুত্র সঊদ বিন আব্দুল আযীয তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। তিনি ছিলেন পিতার চেয়েও অধিক চৌকস ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। পিতার পদাংক অনুসরণ করে দ্রুতগতিতে তিনি নতুন নতুন রাজ্য দখল করতে লাগলেন এবং দাওয়াতের ময়দান বিস্তৃত করে চললেন। বাহরাইন, আম্মান ও রা'স আল- খাইমাহ জয় করার পর তিনি বছরা দখল করে নেন এবং যথারীতি সেখানকার শিরকী আস্তানাসমূহ সমূলে উচ্ছেদ করেন।[৭৩] অতঃপর সবদিক থেকে নিরাপদ হয়ে তিনি আবারো হেজাযের কেন্দ্রভূমি মক্কা-মদীনার দিকে নযর দিলেন এবং ১৮০৫ সালে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে প্রথমে মদীনা দখল করলেন। অতঃপর মদীনার যাবতীয় কবর-মাযার ধূলিসাৎ করে সেখান থেকে শিরক ও বিদ'আতী আমল-আক্বীদা উৎখাত করেন।[৭৪] মদীনা বিজয়ের পর সঊদী বাহিনী মক্কার দিকে অগ্রযাত্রা করলে শরীফ গালিব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পূর্বেই ইমাম সঊদের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন।[৭৫] অতঃপর ১৮১১ সালের মধ্যে ওয়াহ্হাবী সাম্রাজ্য দক্ষিণে আলেপ্পো থেকে শুরু করে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত এবং পূর্বে পারস্য উপসাগর থেকে ইরাকের সীমান্ত হয়ে পশ্চিমে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে।[৭৬]

অবশেষে শংকিত ওছমানীয় সুলতান আর অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করলেন না। তিনি যেকোন মূল্যে ওয়াহ্হাবীদের দমন করার জন্য তৎকালীন তুর্কী সাম্রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক মিসরের খেদিভ মুহাম্মাদ আলী পাশাকে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পেয়ে মুহাম্মাদ আলী পাশা রণপ্রস্তুতি গ্রহণ করলেন এবং তাঁর পুত্র তুসুনের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী হেজাযের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। প্রথমে তুসুন ওয়াহ্হাবীদের সাথে কয়েকটি মোকাবিলায় পরাজিত হলেও ১৮১২ সালে দুই মাস যাবৎ অবরোধ রাখার পর মদীনা দখল করতে সক্ষম হন। পরের বছর মিসরীয়রা একইভাবে মক্কাও দখল করে নেয়। হেজায মিসরীয় দখলে চলে গেলেও আরবের বাকী অংশে ওয়াহ্হাবীদের আধিপত্য অটুট ছিল। মিসরীয়রা বিভিন্ন স্থানে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হলেও বার বার পরাজয়ের শিকার হয়। অবশেষে স্বয়ং মুহাম্মাদ আলী পাশা যুদ্ধের নেতৃত্ব

---

৬৬. Thomas Patrick Hughes, A Dictionary of Islam (London: W.H. Allen & Co., 13 Waterloo palace, Pall Mall S.W. 1895) P. 660.
৬৭. John Lewis Burchhardt, Ibid, P. 329.
৬৮. আল মাওসূ'আতুল আরাবিয়াহ আল-আলামিয়াহ।
৬৯. ইবনে বিশর, প্রাগুক্ত, ১/২৬৪ পৃঃ।
৭০. আমীন আর-রায়হানী, তারিখু নজদ আল-হাদীছ ওয়া মুলহাকাতুহু (বৈরূত : আল-মাতবা'আহ আল-ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ : ১৯২৮), পৃঃ ৫৫।
৭১. ইবনু বিশর, প্রাগুক্ত, ১/২৬৬ পৃঃ; হায়কাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫।
৭২. মাস'ঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২।
৭৩. ইবনে বিশর, প্রাগুক্ত, ১/ ২৬৯ পৃঃ; মাস'ঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৩।
৭৪. ইবনে বিশর, প্রাগুক্ত, ১/২৮৮ পৃঃ; প্রাচ্যবিদ ঐতিহাসিকরা লিখেছেন যে, এসময় রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের উপর থেকে সবুজ গম্বুজটিও ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল। তবে এ ঘটনা সত্য নয়। দ্রঃ মাস'ঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৪।
৭৫. মাস'ঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত; পৃঃ ১১৪; আল-মাওসূ'আতুল আরাবিয়াহ আল-আলামিয়াহ।
৭৬. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ) পৃঃ ৩০৫; Philip K. Hitti, History of Arabs (London : Macmillan Press Ltd, 16th Edition: 1994) p. 741.

দেয়ার জন্য হেজাযে আগমন করেন এবং প্রথম যুদ্ধেই গুরুতর পরাজয় বরণ করেন।[৭৭]

মিসরীয়দের বিরুদ্ধে সঊদী বাহিনী নতুনভাবে যখন একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল, ঠিক তখনই ১৮১৪ সালের ১লা মে ইমাম সঊদ বিন আব্দুল আযীয মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সঊদীদের মনোবল কিছুটা ভেঙে পড়ে। ফলে মিসরীয় বাহিনীর জন্য সমগ্র আরব দখলের পথ সহজ হয়ে গেল।[৭৮] নেতৃত্বগুণে ও মহানুভবতায় ইমাম সঊদ ছিলেন এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। আভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা ও যুদ্ধের ময়দানে তাঁর দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। তাঁর নৈতিকতা ও উদারচিত্ততা ঐতিহাসিকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছে। তাঁর শাসনামলেই হেজাযসহ সমগ্র আরব উপদ্বীপ ওয়াহ্হাবীদের পূর্ণ অধিকারে চলে আসে।[৭৯]

আব্দুল্লাহ বিন সঊদ (১৮১৪-১৮১৮ খৃঃ):

ইমাম সঊদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি পিতার মতই সাহসী ও রণকুশলী হলেও রাষ্ট্র পরিচালনায় তেমন বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেননি।[৮০] মিসরীয়দের সাথে ত্বায়েফের এক বিরাট যুদ্ধে তাঁর ভুল রণকৌশলের কারণে সঊদী বাহিনী চরমভাবে বিপর্যস্ত হয় এবং প্রায় ৫ হাযার সৈন্য মিসরী বাহিনীর হাতে নিহত হয় এবং ৩ হাযার সৈন্য গ্রেফতার হয়। এতে ওয়াহ্হাবীদের শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়।[৮১] এ যুদ্ধে মুহাম্মাদ আলী পাশা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধের পর তিনি তুসূনকে রেখে সাময়িকভাবে মিসরে যান। ইতিমধ্যে তুসূন আল-কাছীমে শিবির গড়ে নজদ আক্রমণের প্রস্তুতি নিলে ইমাম আব্দুল্লাহ সেখানে তাদেরকে অবরোধ করতে সমর্থ হন। দুই মাস যাবৎ অবরোধের পর উভয় পক্ষ সন্ধিতে রাযী হয়। ইমাম আব্দুল্লাহ প্রতিকূল পরিবেশ বিবেচনা করে মিসরীয়দের সাথে সন্ধি করাকেই নিরাপদ মনে করলেন।[৮২] ১৮১৫ সালে স্বাক্ষরিত এই চুক্তির শর্ত নির্ধারিত হল যে, ইমাম আব্দুল্লাহ তুর্কী সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করে নিবেন এবং সেনাপতি তূসূন মিসরীয়দের নিয়ে নজদভূমি ছেড়ে যাবেন।[৮৩] কিন্তু খেদিভ মুহাম্মাদ আলী পাশা এই চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে পরের বছর তাঁর ২য় পুত্র ইবরাহীম পাশার নেতৃত্বে আরব ভূখণ্ডে এক অভিযান প্রেরণ করেন।[৮৪] ইবরাহীম পাশা কতিপয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৮১৮ সালে ওয়াহ্হাবীদের রাজধানী দিরঈইয়া নগরী অবরোধ করেন। দীর্ঘ ৬ মাসের টানা অবরোধে অবশেষে ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইমাম আব্দুল্লাহ বিন সঊদ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। অতঃপর তাঁকে তুর্কী খেলাফতের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে নেওয়া হয় এবং ডিসেম্বরের ১৭ তারিখে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।[৮৫] এভাবেই ১ম সঊদী রাষ্ট্র কিংবা ঐতিহাসিক ফিলবীর ভাষায় '১ম ওয়াহ্হাবী সাম্রাজ্য'-এর করুণ অবসান ঘটল।[৮৬] উন্মত্ত মিসরীয় বাহিনী এ সময় সঊদ বংশের আরো ২১ জনকে হত্যা করে। এছাড়া মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের বংশধরদের বেশ কয়েকজনসহ বহুসংখ্যক আলেম-ওলামা ও কাযীগণ নিহত হন। অবশিষ্টদেরকে মিসর ও ইস্তাম্বুলে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[৮৭]

দিরঈইয়ার পতনের পর মুহাম্মাদ আলী পাশা সেখানে ৯ মাস অবস্থান করেন এবং শহরের সমস্ত অধিবাসীদের নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়ে সরকারী প্রাসাদ-দূর্গ, বাড়ী-ঘর, গাছ-পালা একে একে সমূলে ধ্বংস করে ফেলেন। সমস্ত শহরকে এমনইভাবে বিরান করে ফেলা হয় যেন সেখানে ইতিপূর্বে কোন জনবসতিই ছিল না।[৮৮] পৌনে এক শতাব্দীকাল ব্যাপী যে নগরী আরব যমীনে তথা সারাবিশ্বের বুকে অভূতপূর্ব এক দ্বীনী জাগরণের পাদপীঠ হিসাবে তাওহীদী নিশান বহন করছিল, এক নিমিষেই তা জনমানবহীন এক ঊষর মৃত্যুপুরীতে পরিণত হল। অপমৃত্যু ঘটল শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের হাতে গড়া 'মানহাজুন নবুওয়াত' এবং তাওহীদ ও সুন্নাতের জ্বলন্ত স্বাক্ষর এই পবিত্র সাম্রাজ্যের। ভোজবাজির মত হারিয়ে যাওয়া প্রতাপশালী এ রাষ্ট্রের কথা স্মরণ করতে যেয়ে তাই ১৮৮০ সালে ঐতিহাসিক ব্লেন্ট লিখেছিলেন, 'আরবের বুকে সঊদী রাষ্ট্র আজ কেবল অতীত কেচ্ছা মাত্র।'[৮৯] অনুরূপভাবে ১৮৭৫ সালে ডাউটি নজদবাসীদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তাদের সকলেরই কমপক্ষে এই মত ছিল যে, এই ওয়াহ্হাবী রাষ্ট্রের নতুন করে জেগে উঠার আর কোন সম্ভাবনা নেই।[৯০] তবে আলহামদুলিল্লাহ শত্রুদের এই লোমহর্ষক নৃশংসতার পরও ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের সুপ্ত কোন বীজ থেকে আবারো পুনর্জন্ম নিয়েছিল সঊদী আরব রাষ্ট্র। ফলে দিরঈইয়া ইতিহাস থেকে হারিয়ে গেলেও পার্শ্ববর্তী রিয়াযেই আবার প্রতিষ্ঠিত

---

৭৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৫; মাস'ঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭; আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, ১৮১৪ সালে তারাবা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যেসব যুদ্ধ হয়, তাতে ওয়াহ্হাবীদের পক্ষে নেতৃত্বে ছিলেন 'গালিয়া আল-বাক্বমিয়াহ' নাম্মী এক বিধবা ধনী মহিলা। বুদ্ধিমত্তা ও প্রখর ব্যক্তিত্বের কারণে কার্যত তিনিই ছিলেন তারাবার শাসক। ওয়াহ্হাবীদেরকে তিনি প্রচুর ধন-সম্পদ ও যোদ্ধা সরবরাহ করে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছিলেন। তারাবার পরাজয়ের পর মুছত্বফা বেক-এর নেতৃত্বাধীন তুর্কী সৈনিকরা যুদ্ধে গালিয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাঁকেই সম্মিলিত ওয়াহ্হাবী বাহিনীর নেতৃত্বদানকারিনী হিসাবে ধারণা করেছিল *(John Lewis Burchhardt, Ibid, P.371)*।

৭৮. ইবনে বিশর, প্রাগুক্ত, ১/৩৬৪ পৃঃ; মাস'ঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৯।

৭৯. মাস'ঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, ১২৮-১৩০ পৃঃ; আমীন আর রায়হানী, প্রাগুক্ত, ৬২ পৃঃ; John Lewis Burchhardt, Ibid, P.382.

৮০. John Lewis Burchhardt, Ibid, P.288.

৮১. John Lewis Burchhardt, Ibid, P.398; বারখার্ট উক্ত যুদ্ধে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ আলী পাশার কৌশলে ওয়াহ্হাবীরা উন্মুক্ত ময়দানে নেমে এসে ফাঁদে আটকা পড়ে এবং চারিদিকে ঘেরাও হয়ে যায়। এমতাবস্থায় মুহাম্মাদ আলী ঘোষণা দেন যে, প্রত্যেক ওয়াহ্হাবীর মাথার মূল্য ৬ ডলার। ফলে মিসরীয় সৈন্যরা পাইকারী হারে ওয়াহ্হাবীদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালানো শুরু করল। কয়েক ঘন্টার মধ্যে প্রায় ৫ হাযার লাশের স্তুপ জমে গেল যুদ্ধের ময়দানে, যাদেরকে টুকরো টুকরো করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। পরে বন্দীদের মক্কায় নেয়ার পর অধিকাংশকেই নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

৮২. ইবনু বিশর, প্রাগুক্ত, ১/৩৭৮ পৃঃ; তবে ঐতিহাসিকদের মতে, তাঁর এই সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। কেননা তার সামনে ছিল দু'মাসের অবরোধে দুর্বল হয়ে পড়া মিসরীয়দের আরবের মাটি থেকে উচ্ছেদ করার সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু এ সুযোগ কাজে না লাগিয়ে নিজেকে তিনি নিশ্চিত বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিলেন। দ্রঃ মাস'ঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৪।

৮৩. মাস'ঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩।

৮৪. John Lewis Burchhardt, Ibid, P.419.

৮৫. ইবনু বিশর, প্রাগুক্ত, ১/৪২২ পৃঃ; মাস'ঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪১।

৮৬. মাস'ঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪০।

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪০।

৮৮. ইবনু বিশর, প্রাগুক্ত, ১/৪৩৪ পৃঃ; মাস'ঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, ১৪৫ পৃঃ; আমীন আর-রায়হানী, প্রাগুক্ত, ৭৬ পৃঃ।

৮৯. মাস'ঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, ১৪৮ পৃঃ।

৯০. প্রাগুক্ত, ১৪৯ পৃঃ।

হয়েছিল ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের উত্তর পুরুষদের নতুন রাজধানী।

১ম সঊদী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য :

মানহাজুন নবুওয়াতের আদলে গড়ে উঠা এই রাষ্ট্রটির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচিত হল।

(১) রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা :

ইসলামী আক্বীদার পরিশুদ্ধি এবং তাওহীদ ও সুন্নাহ্র বিজয় সাধনের প্রতিজ্ঞা থেকেই জন্ম হয় ১ম সঊদী আরব রাষ্ট্রের। এ রাষ্ট্রের প্রধানকে 'ইমাম' বলা হ'ত এবং তিনিই ছিলেন সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী।[৯১] তিনি যেমন ছিলেন ধর্মীয় নেতা, তেমনি ছিলেন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কও। ফলে ন্যায় ও ইনছাফের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং ইমামের একক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত এই রাষ্ট্রে ইসলামী শরীআ'ত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় যাবতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ত ইসলামী শরীআ'তের পুংখানুপুংখ অনুসরণের ভিত্তিতে। যার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেছেন পর্যটক বারখার্ট তাঁর গ্রন্থে।[৯২] প্রাদেশিক শাসকদেরকে কেন্দ্রীয় ইমামই জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দান করতেন। তাদের আক্বীদা ও আমলের দৃঢ়তার প্রতি বিশেষ নযর রাখা হ'ত। এছাড়া সর্বস্তরে বিশেষ শূরা বা পরামর্শ কমিটি ও সাধারণ পরামর্শ কমিটি নামক দু'টি শক্তিশালী কমিটির মাধ্যমে পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী আঞ্জাম দেয়া হ'ত।[৯৩] এছাড়া ওয়াহ্হাবী ইমামদের চাল-চলন ও ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় বারখার্টের বর্ণনায় তাতে তাঁদের সহজ-সরল ইসলামী জীবনযাপনের চমৎকার পরিচয় ফুটে উঠে।[৯৪]

(২) সামরিক নীতি :

যুদ্ধ-বিগ্রহের ক্ষেত্রেও পুরোপুরি ইসলামী নীতিমালা অনুসৃত হ'ত এবং গণীমতের মালকে নিয়মমাফিক ৫ ভাগে ভাগ করা হ'ত। সাধারণত বাদ ফজর তাকবীরের মাধ্যমে সেনাদলের যুদ্ধযাত্রা শুরু করা হত এবং বিজিত অঞ্চলে আত্মসমর্পণকারী স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতি ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ন্যায় ও ইনছাফের আচরণ করা হত।[৯৫] বিজিত অঞ্চলে ওয়াহ্হাবীদের প্রথম কাজ ছিল শিরক ও বিদ'আতের আখড়াগুলো ধ্বংস করে দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদের বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা ও ইসলামী আইন কার্যকর করার জন্য ক্বাযী ও মুফতী নিয়োগ করা।[৯৬]

(৩) সামাজিক অবস্থা :

ইমাম আব্দুল আযীযের শাসনামলে আরব ভূখণ্ড পরিণত হয় এক ঐক্যবদ্ধ, স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ রাজ্যে। ওয়াহহাবী দাঈদের মাধ্যমে বেদুইনদের মাঝে ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা প্রসার লাভ করে। ফলে কলহপ্রিয় ও সংঘাতে লিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরব বেদুইন গোত্রসমূহ পারস্পরিক সংঘাত ভুলে গিয়ে পরস্পর ভাই-ভাইয়ে পরিণত হয়। অথচ স্বর্ণযুগের পর এ দৃশ্য ছিল এক অকল্পনীয় ব্যাপার।[৯৭] সমাজ থেকে সকল অনৈতিক আচার-প্রথা উচ্ছেদ করা হয়েছিল। তুর্কীদের মধ্যে সিল্কের পোষাক পরা ও ধূমপানের যে বাজে অভ্যাস ছিল তা দূরীভূত করা হয়।[৯৮] নারীদের বেপর্দা চলাফেরা নিষিদ্ধ ছিল। ছালাতের সময় বাজারে দায়িত্বশীলরা 'ছালাত, ছালাত' বলে মানুষকে মসজিদের দিকে আহ্বান করত এবং ছালাত তরককারীদের শাস্তি দিত। ফলে ছালাতের সময় কারো বাইরে ঘুরাফিরার সুযোগ ছিল না।[৯৯] এভাবে একটি আইন-কানূনবিহীন বর্বর সমাজে ওয়াহ্হাবীরা নৈতিকতা ও ন্যায়বিচারের যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল– তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বারখার্ট বলেন, The merit, therefore, of the Wahabys, in my opinion, is not that they purified the existing religion, but that they made the Arab strictly observe the positive precepts of one certain religion. অর্থাৎ আমার মতে, এটাই ওয়াহ্হাবীদের কৃতিত্ব নয় যে, তারা প্রচলিত ধর্মমতকে পরিশুদ্ধ করেছিল বরং আরবদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট ধর্মের সদর্থক নৈতিক শিক্ষাসমূহ কঠোরভাবে পালনে অভ্যস্ত করতে পারাই ছিল তাদের মূল কৃতিত্ব।[১০০]

(৪) বিচারব্যবস্থা :

নজদের বিচারব্যবস্থা ছিল পূর্ণাঙ্গভাবে কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফে ছালেহীনের নীতির উপর ভিত্তিশীল।[১০১] রাজ্যে বিচারপতির পদ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিচারক নির্বাচিত হওয়ার জন্য আলেমে দ্বীন হওয়া এবং ইসলামী শরীআ'তের উপর বিশেষ দক্ষতা অপরিহার্য ছিল। সাথে সাথে তার ন্যায়পরায়ণতার দিকটি ছিল সর্বাধিক বিবেচ্য। ইসলামী শরী'আতের ফৌজদারী কার্যবিধি তথা হুদূদ আইন পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। বিচারকগণ বিশেষ কোন মাযহাবের প্রতি আনুগত্য দেখাতেন না; বরং সর্বাধিক অগ্রাধিকারযোগ্য মত অনুযায়ী ফয়ছালা করতেন। বিচার প্রক্রিয়ায় কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ও শিথিলতার সুযোগ না থাকা এবং দ্রুততম সময়ে রায় কার্যকরের ফলে গোটা রাজ্যে সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী আইনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও আনুগত্যবোধ সৃষ্টি হয়। ফলে পাপাচার ও হানাহানির প্রবণতা একেবারেই হ্রাস পেয়ে যায়।[১০২] স্বর্ণযুগের পর বেদুইন আরবের সামাজিক পরিমণ্ডল আবারও সিক্ত হ'তে থাকে ন্যায়, ইনছাফ ও শান্তির অজস্র স্রোতধারায়। পর্যটক Burchhardt বলেন, For the first time after, perhaps, since the days of Muhammad, a single marchent

৯১. John Lewis Burchhardt, Ibid, P.293.
৯২. Ibid, P.278-83.
৯৩. আল-মাওসূ'আতুল আরাবিয়াহ আল-আলামিয়াহ।
৯৪. John Lewis Burchhardt, Ibid, P. 287-293.
৯৫. John Lewis Burchhardt, Ibid, P.319. ইবনে বিশর, প্রাগুক্ত, ১/২৭৭ পৃঃ।
৯৬. Ibid, P. 280-281; আল-মাওসূ'আতুল আরাবিয়াহ আল-আলামিয়াহ।
৯৭. James Wynbrant, Ibid, P. 127.
৯৮. John Lewis Burchhardt, Ibid, P. 283.
৯৯. মাস'উদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, ১১৭-১১৯ পৃঃ।
১০০. John Lewis Burchhardt, Ibid, P. 285.
১০১. John Lewis Burchhardt, Ibid, P. 296.
১০২. আল-মাওসূ'আতুল আরাবিয়াহ আল-আলামিয়াহ; আমীন আর-রায়হানী, প্রাগুক্ত, ৬২ পৃঃ; John Lewis Burchhardt, Ibid, P. 286.

might traverse the desert of Arabia with perfect safety, and the Bedouins slept without any apprehension that their cattle would be carried off by nocturnal depredators অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর যুগের পর সম্ভবত এই প্রথমবারের মত কোন ব্যবসায়ী মরুভূমির মাঝে একাকী পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে চলাচল করত, আর রাত্রিতে দস্যু দলের হাতে গৃহপালিত পশু-প্রাণী লুট হওয়ার কোন আশংকা ছাড়াই বেদুইনরা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারত।[১০৩] হানাহানির মাত্রা এতটাই কমে আসে যে তিনি লিখেছেন, আমি নিশ্চিত করে বলছি, ইবনে সঊদের ১১ বছরের শাসনামলে দিরঈইয়ায় মাত্র ৪/৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল।[১০৪] ঐতিহাসিক ইবনে বিশর ইমাম আব্দুল আযীযের শাসনামলের শান্তি-শৃংখলার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলেন, তাঁকে সত্যিই যুগের 'মাহদী' হিসাবে আখ্যা দেয়া যায়। কেননা তাঁর শাসনামলে একজন মানুষ মূল্যবান ধন-সম্পদসহ শীত-গ্রীষ্ম, ডান-বাম, পূর্ব-পশ্চিম যখন যেখানে খুশী নজদ, হেজায, ইয়ামান, আম্মান সর্বত্রই নির্বিঘ্নে সফর করত। এমতাবস্থায় সে কেবল আল্লাহ ছাড়া কোন চোর বা দস্যুর ভয় পেত না।[১০৫]

(৫) অর্থব্যবস্থা :

অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রেও পুরোপুরিভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর যুগকে অনুসরণ করা হ'ত। বায়তুল মাল ছিল এই ওয়াহ্হাবী রাজ্যের প্রধান অর্থ তহবিল। এই তহবিলের মূল উৎস ছিল যাকাত এবং ওশর। গণীমতের এক-পঞ্চমাংশও ছিল এর অন্যতম উৎস। জনগণের উপর বাড়তি কোন করারোপ করা হ'ত না।[১০৬] সূদী কারবারকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। কর্য হিসাবে অর্থ প্রদান কেবলমাত্র মুযারাবা ও মুশারাকার ক্ষেত্রে অনুমোদিত ছিল।[১০৭] আর কুরআনে বর্ণিত খাতসমূহেই বায়তুল মালের অর্থ ব্যয়িত হ'ত এবং এখান থেকেই রাষ্ট্রীয় সকল ব্যয় নির্বাহ করা হ'ত।[১০৮] সামাজিক শান্তি ও শৃংখলার অসাধারণ উন্নতি আরবদেরকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করেছিল। বাজারে খাদ্যদ্রব্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ ছিল এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাস পেয়েছিল।[১০৯] চাষাবাদ ও পশুপালন ছিল জনগণের জীবিকা নির্বাহের মূল উপাদান। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য তো ছিল তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য। দূর-দূরান্তে ব্যবসার উদ্দেশ্যে গমন করা ছিল তাদের নিয়মিত অভ্যাস। পার্শ্ববর্তী বছরা, জেদ্দা, ছানআ', বাহরাইন, কুয়েত, দেমাশক ছাড়াও সুদূর দিল্লী পর্যন্ত তাদের ব্যবসায়িক যোগাযোগ ছিল। এসব ব্যবসায়িক কাফেলা একই সাথে ইসলামের বিশুদ্ধ দাওয়াতও দেশে দেশে বহন করে নিয়ে যেত।[১১০]

(৬) শিক্ষাব্যবস্থা :

শিক্ষাগার হিসাবে তখন মসজিদ এবং মক্তব সমূহই ব্যবহৃত হ'ত। যেখানে প্রথম স্তরের দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা ছিল। রিয়াযুছ ছালেহীন, তাফসীরে ত্বাবারী, তাফসীরে ইবনে কাছীর, ইবনু তায়মিয়াহ্‌র গ্রন্থসমূহ এবং শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের গ্রন্থসমূহ সেখানে অবশ্যপাঠ্য ছিল। এছাড়া আরবী সাহিত্য, উলূমুল কুরআন ও হাদীছ এবং গণিতও শিক্ষা দেয়া হত। শায়খ নিজে এবং তাঁর সন্তানাদি ও ছাত্ররা রাজ্যের সর্বত্র শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ছাত্রদের শিক্ষা ব্যয় এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতা রাষ্ট্রীয়ভাবেই বহন করা হ'ত।[১১১] সেখানে জ্ঞানচর্চার হার এমনই বৃদ্ধি পায় যে, কোন কোন ঐতিহাসিক দিরঈইয়াকে মধ্যযুগের রোমের সাথে তুলনা করেছেন।[১১২]

(৭) বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক :

প্রতাপশালী তুর্কী সালতানাতের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে গোটা আরব উপদ্বীপের বিশাল এলাকা জুড়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করে তাক লাগিয়ে দেয় ওয়াহ্হাবীরা। তাদের এই উত্থানকে পার্শ্ববর্তী তুর্কী সালতানাতের অনুগত মুসলিম অঞ্চলসমূহ মোটেও ভাল চোখে নেয়নি; বরং ওয়াহ্হাবীদের শিরক ও বিদ'আত বিরোধী কঠোর সংস্কারবাদী মনোভাবের কারণে তারা মনেপ্রাণে তাদের পতন কামনা করছিল। ফলে আরবের বাইরে ওয়াহ্হাবীদের কোন মিত্র ছিল না। তবে আরবের সর্বত্র সঊদীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব লক্ষ্য করে বৃটিশরা তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে সঊদীদের সাথে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপনের পরিকল্পনা করে। এ লক্ষ্যে ১৭৯৯ সালে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুয়েত প্রতিনিধি রেনল্ডের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল দিরঈইয়া সফর করে। এ সময় ইমাম আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ বিন সঊদ তাঁদেরকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান। এটাই ছিল দিরঈইয়ার সাথে কোন বহির্দেশের প্রথম সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস। কিন্তু এ আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। সঊদীরা বৃটিশদের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন থাকায় এ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন না। ফলে পরবর্তীতে যদিও বৃটিশরা ওয়াহ্হাবীদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিল কিন্তু দিরঈইয়ার পতনের সাথে সাথে মিসরীয় সেনাপতি ইবরাহীম পাশাকে সংবর্ধনা প্রদান এবং ওয়াহ্হাবীদের বিরুদ্ধে অপবাদমূলক প্রপাগাণ্ডা চালানোর মাধ্যমে তাদের শঠতায় আঁটা মুখোশ উন্মোচিত হয়।[১১৩]

পরিশেষে বলা যায়, ১ম সঊদী রাষ্ট্রটি ছিল ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের জন্য দর্পণস্বরূপ। নজদের বুকে যে সংস্কারের আহ্বান নিয়ে ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটেছিল, তার হাতে-কলমে বাস্তবায়নক্ষেত্র ছিল এই রাষ্ট্রটি। একটি প্রতিকূল পরিবেশে 'মানহাজুন নবুওয়াত' তথা রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের নীতিমালা অনুযায়ী সমাজ পরিচালনার যে দুঃসাধ্য চ্যালেঞ্জ নিয়ে ওয়াহ্হাবীরা ময়দানে নেমেছিল এবং আরব উপদ্বীপ থেকে শিরক ও বিদ'আতকে সম্পূর্ণভাবে

---

১০৩. John Lewis Burchhardt, Ibid, P.297.
১০৪. Ibid, P.298.
১০৫. ইবনে বিশর, প্রাগুক্ত, ১/২৬৭ পৃঃ।
১০৬. ইবনে বিশর, প্রাগুক্ত, ১/২৭৩-২৭৪ পৃঃ।
১০৭. John Lewis Burchhardt, Ibid, P.304.
১০৮. ইবনে বিশর, প্রাগুক্ত, ১/২৭৫ পৃঃ।
১০৯. মাস'উদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯।
১১০. আল-মাওসূ'আতুল আরাবিয়াহ আল-আলামিয়াহ।
১১১. আল-মাওসূ'আতুল আরাবিয়াহ আল-আলামিয়াহ।
১১২. আমীন আর-রায়হানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২।
১১৩. আল-মাওসূ'আতুল আরাবিয়াহ আল-আলামিয়াহ; মাসঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৬।

উৎখাত করতে সক্ষম হয়েছিল, তা সত্যিই তাদের অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। আল্লাহ্র অসীম রহমত যে, শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব ও তাঁর যোগ্য উত্তরসূরীরা এই মহান দায়িত্ব পালন করে আধুনিক মুসলিম বিশ্বকে পথভ্রষ্টতার অতল তলে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।[১১৪] এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই সম্ভব হয়েছিল সুদীর্ঘকাল পর বিশৃংখল, দাঙ্গাবাজ আরব বেদুঈনদেরকে একক নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করে একটি সুশৃংখল ও শক্তিশালী আরব রাষ্ট্রগঠনের এই বিস্ময়কর পর্বটিও।[১১৫] এর মাধ্যমে স্বর্ণযুগের পর অহিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার অনন্য নযীর হিসাবে আরো একবার সারাবিশ্বের নযর কাড়তে সক্ষম হয় আরব ভূখণ্ড। ফলে কয়েক শত বছর ধরে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বহীন হয়ে পড়া এবং ধর্মীয় অধঃপতনে নিমজ্জিত থাকা আরবভূমি আবারো তাওহীদী ঐশ্বর্যে সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠে। রাজনৈতিক পতন ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের দুর্দমনীয় অগ্রগতিতে ছেদ টেনে দিল বটে; কিন্তু এর ধর্মীয় প্রভাবকে কখনই স্তিমিত করতে পারেনি। ফলে পূর্বদিকে সুদূর ইন্দোনেশিয়া থেকে পশ্চিমে নাইজেরিয়া পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র এ আন্দোলনের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়েছিল। পি. কে. হিট্টি বলেন, Wahhabi tenets, however, continued to spread, and their influence was felt from Sumatra in the east to Nigeria in the west. অর্থাৎ 'ওয়াহ্হাবীদের পতন সত্ত্বেও ওয়াহ্হাবী মতবাদের প্রসার অব্যাহত থাকে এবং তাদের প্রভাব পূর্বে সুমাত্রা থেকে শুরু করে পশ্চিমে নাইজেরিয়া পর্যন্ত অনুভূত হতে থাকে।[১১৬] লোথরোপ স্টোডার্ড বলেন, However, wahhabism's spritual role had just begun, The Nejd remained a focus of puritan zeal whence the new spirit rediated in all directions অর্থাৎ 'ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের ধর্মীয় দিকটির প্রসার বরং তখনই শুরু হয়েছিল। বিশুদ্ধতাবাদী দাওয়াতের উদ্দীপনাকেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল যে নজদ, তা আগের মতই মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রইল; যখন নবপ্রেরণা নিয়ে নানা দিকে নানা মাত্রায় তার বিকিরণ ঘটতে থাকল'।[১১৭]

[চলবে]

১১৪. যার ধারাবাহিকতা পরবর্তীরাও কম-বেশী অনুসরণ করার ফলে আজও পর্যন্ত সঊদী আরবের মাটিতে ইসলামের মূল রূহটা বহুলাংশেই টিকে রয়েছে এবং শিরক ও বিদ'আতের উপস্থিতি সেখানে প্রায় নেই বললেই চলে।- *লেখক*।

১১৫. মুনীর আল-আজলানী, তারীখুদ দাওলাহ আস-সঊদিয়াহ (রিয়াদ : দারুস সুনবুল, ১৪১৩ হিঃ), ২/১৯ পৃঃ; Madawi Al-Rasheed, A history of Saudi Arabia (Cambridge : Cambridge University Press, 2002), P. 21-22.

১১৬. Philip K. Hitti, Ibid, P. 741.

১১৭. Lothrop Stodderd, The new world of Islam (London : Chapman and Hall Ltd, 1922) P. 22.

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাক্বলীদ

*শরীফুল ইসলাম**

ভূমিকা :

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যা আল্লাহ তা'আলা বিশ্বমানবতার জন্য দান করেছেন। আর তাকে বাস্তবায়ন করার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান অহী মারফত জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং অহী-র বিধানই একমাত্র অভ্রান্ত জীবনবিধান। বর্তমান বিশ্বে প্রায় দেড়শত কোটি মুসলমান বসবাস করে। তারা বিশ্বের অন্যান্য জাতির সাথে তাল মিলিয়ে সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এগিয়ে চলেছে। পিছিয়ে পড়েছে শুধু আল্লাহ্র বিধান পালনে। ফলে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও অনেকের আচরণ অমুসলিম-কাফেরদের সাথে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ। আবার যারা ইসলামের বিধান বাস্তবায়নে নিয়োজিত, তারা অধিকাংশই শতধাবিভক্ত। বিভিন্ন তরীকা ও মাযহাবের বেড়াজালে নিজেদেরকে আবদ্ধ রেখে, পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন করছে। নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অন্ধানুসরণের কারণে আল্লাহ প্রদত্ত অহী-র বিধানকে বাদ দিয়ে মাযহাবী গোঁড়ামিকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। তারা নিজেদেরকে মাযহাবের প্রকৃত অনুসারী দাবী করলেও মূলতঃ তারা অনুসরণীয় ইমামগণের কথাকে উপেক্ষা করে তাঁদের অবমাননা করছে। কারণ প্রত্যেক ইমামই তাঁদের তাক্বলীদ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এ নিবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

তাক্বলীদের শাব্দিক অর্থ :

'তাক্বলীদ' (التقليد) শব্দটি 'ক্বালাদাতুন' (قـــلادة) হ'তে গৃহীত। যার অর্থ কণ্ঠহার বা রশি। যেমন বলা হয়, قَلَّدَ الْبَعِيْرَ 'সে উটের গলায় রশি বেঁধেছে'। সেখান থেকে 'মুক্বাল্লিদ' (مقلـــد), যিনি কারো আনুগত্যের রশি নিজের গলায় বেঁধে নিয়েছেন।

তাক্বলীদের পারিভাষিক অর্থ :

তাক্বলীদ হ'ল শারঈ বিষয়ে কোন মুজতাহিদ বা শরী'আত গবেষকের কথাকে বিনা দলীল-প্রমাণে চোখ বুজে গ্রহণ করা।

আল্লামা জুরজানী (রহঃ)-এর মতে, التقليد هو قبول قول الغير بلا حجـــة ولا دليـــل. 'তাক্বলীদ হ'ল বিনা দলীল-প্রমাণে অন্যের কথা গ্রহণ করা'।[১১৮]

ইমাম শাওকানী (রহঃ)-এর মতে, التقليد هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بـــلا حجـــة. 'তাক্বলীদ হ'ল বিনা দলীলে

** লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

১১৮. জুরজানী, কিতাবুত তা'রীফাত, পৃঃ ৬৪।

অন্যের মত গ্রহণ করা, যার মত দলীল হিসাবে সাব্যস্ত হবে না'।[১১৯]

'তাফসীরে আযওয়াউল বায়ান'-এর লেখক মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী (রহঃ)-এর মতে, التقليد هو قبول قول الغير من غير معرفة دليله. 'তাক্বলীদ হ'ল কারো দলীল সম্পর্কে অবহিত না হয়ে তার কথা গ্রহণ করা'।[১২০]

তাক্বলীদের উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, শারঈ বিষয়ে কারো কোন কথা বিনা দলীলে গ্রহণ করাই তাক্বলীদ। পক্ষান্তরে দলীলসহ গ্রহণ করলে তা হয় ইত্তেবা। আভিধানিক অর্থে ইত্তেবা হচ্ছে পদাংক অনুসরণ করা। পারিভাষিক অর্থে قبول قول الغير مع دليل 'শারঈ বিষয়ে কারো কোন কথা দলীল সহ মেনে নেওয়া'।

তাক্বলীদের প্রকারভেদ :

তাক্বলীদ দু'প্রকার- জাতীয় তাক্বলীদ ও বিজাতীয় তাক্বলীদ। জাতীয় তাক্বলীদ বলতে ধর্মের নামে মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন মাযহাব ও তরীক্বার অন্ধ অনুসরণ বুঝায়। বিজাতীয় তাক্বলীদ বলতে বৈষয়িক ব্যাপারের নামে সমাজে প্রচলিত পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রভৃতি বিজাতীয় মতবাদের অন্ধ অনুসরণ বুঝায়।

ইত্তেবা ও তাক্বলীদের মধ্যে পার্থক্য :

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হ'তে প্রেরিত অহী-র বিধানের যথাযথ অনুসরণের নাম ইত্তেবা। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ- اتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ-

'তোমার নিকট এজন্য কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমার অন্তরে যেন এর সম্পর্কে কোন সংকোচ না থাকে এর দ্বারা সতর্কীকরণের ব্যাপারে এবং এটা মুমিনদের জন্য উপদেশ। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কোন অলি-আউলিয়ার অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক' *(আ'রাফ ৭/২-৩)*।

তাক্বলীদ ও ইত্তেবা দু'টি ভিন্ন বিষয়। এদু'টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 'তাক্বলীদ' হ'ল নবী ব্যতীত অন্য কারো শারঈ বক্তব্যকে বিনা দলীলে গ্রহণ করা। পক্ষান্তরে ছহীহ দলীল অনুযায়ী নবীর অনুসরণ করাকে বলা হয় 'ইত্তেবা'। একটি হ'ল দলীল ব্যতীত অন্যের রায়ের অনুসরণ। আর অন্যটি হ'ল দলীলের অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুসরণ। মূলতঃ 'তাক্বলীদ' হ'ল রায়ের অনুসরণ। আর 'ইত্তেবা' হ'ল 'রেওয়ায়াতে'র অনুসরণ।[১২১] যেমন ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, اَلتَّقْلِيْدُ إِنَّمَا هُوَ قُبُوْلُ الرَّأْيِ وَالْإِتِّبَاعُ إِنَّمَا هُوَ قُبُوْلُ الرِّوَايَةِ، فَالْإِتِّبَاعُ فِي الدِّيْنِ مَسْنُوْعٌ وَالتَّقْلِيْدُ مَمْنُوْعٌ.

'তাক্বলীদ হ'ল রায়-এর অনুসরণ এবং 'ইত্তেবা' হ'ল রেওয়ায়াতের অনুসরণ। ইসলামী শরী'আতে 'ইত্তেবা' সিদ্ধ এবং 'তাক্বলীদ' নিষিদ্ধ'।[১২২]

মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী (রহঃ) বলেন, 'তাক্বলীদ হ'ল কারো দলীল সম্পর্কে অবহিত না হয়ে তার কথা গ্রহণ করা, যা তার ইজতিহাদ বা গবেষণা ব্যতীত কিছুই নয়। পক্ষান্তরে শারঈ দলীল কারো মাযহাব ও কথা নয়; বরং তা একমাত্র অহী-র বিধান, যার অনুসরণ করা সকলের উপর ওয়াজিব'।[১২৩]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) বলেন, 'ইত্তেবা হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং তার ছাহাবীগণ হ'তে যা কিছু এসেছে তা গ্রহণ করা'। অতঃপর তিনি বলেন, 'তোমরা আমার তাক্বলীদ করো না এবং তাক্বলীদ করো না মালেক, ছাওরী ও আওযা'ঈরও। বরং গ্রহণ কর তারা যা হ'তে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ।[১২৪]

উল্লেখ্য যে, কোন আলেমের ছহীহ দলীল ভিত্তিক কোন কথাকে মেনে নেওয়ার নাম 'তাক্বলীদ' নয়, বরং তা হ'ল 'ইত্তেবা'। অনুরূপভাবে কোন আলেমের দেওয়া ফৎওয়ার বিপরীতে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া গেলে উক্ত ফৎওয়া পরিত্যাগ করে ছহীহ দলীলের অনুসরণ করাকে বলা হয় 'ইত্তেবা'। ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে ইযামের যুগে তাক্বলীদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। বরং তাঁদের দলীলভিত্তিক কথার অনুসরণকে অনেকে 'তাক্বলীদ' বলে ভুল বুঝিয়েছেন।

ইসলাম মানব জাতিকে আল্লাহ প্রেরিত সত্য গ্রহণ ও তাঁর নবীর ইত্তেবা করতে আহ্বান জানিয়েছে। কোন মানুষের ব্যক্তিগত রায়ের অনুসরণ করতে কখনই বলেনি। কোন মানুষ যেহেতু ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তাই মানবরচিত কোন মতবাদই প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। সেই মতবাদে পৃথিবীতে শান্তিও আসতে পারে না। আর এজন্যই নবী ব্যতীত অন্যের তাক্বলীদ নিষিদ্ধ এবং নবীর ইত্তেবা মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

তাক্বলীদের ব্যাপারে চার ইমামের নিষেধাজ্ঞা :

ইসলামের প্রসিদ্ধ চার ইমাম অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এবং

১১৯. ইমাম শাওকানী, ইরশাদুস সায়েল ইলা দালায়িলিল মাসায়েল, পৃঃ ৪০৮।
১২০. মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী, মুযাক্কিরাতু উছূলিল ফিক্বহ, পৃঃ ৪৯০।

১২১. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তিনটি মতবাদ (রাজশাহী ঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, পৃঃ ৭।
৩. শাওকানী, আল-ক্বাওলুল মুফীদ (মিসরী ছাপা ১৩৪০/১৯২১ খৃঃ), পৃঃ ১৪।
১২৩. ঐ।
১২৪. ইবনুল কাইয়িম, ইলামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ৩/৪৬৯পৃঃ।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) তাঁরা প্রত্যেকেই বিরাট পণ্ডিত, পরহেযগার এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন। দুনিয়ার বুকে পিওর ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁরা প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন মানুষের সার্বিক জীবনকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী গড়ে তোলার। কোন মাসআলার ফায়ছালা কুরআন ও ছহীহ হাদীছে না পেলে তাঁরা ইজতিহাদ বা গবেষণা করে ফায়ছালা প্রদান করেছেন। তাতে ভুল হ'লেও তাঁরা ছওয়াবের অধিকারী হয়েছেন। এ ব্যাপারে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন, 'কোন বিচারক ইজতিহাদে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তার জন্য আছে দু'টি পুরস্কার। আর বিচারক ইজতিহাদে ভুল করলে তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার'।[১২৫]

অত্র হাদীছের উপর ভিত্তি করেই ইমামগণ ইজতিহাদ বা শরী'আত গবেষণা করে মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই হাদীছ না থাকলে হয়তবা তাঁরা ইজতিহাদ করতেন না। কারণ তাঁরা ভয় করতেন যে, তাঁদের কথা কুরআন ও সুন্নাহ্র বিরুদ্ধে যেতে পারে। এজন্য তাঁরা তাঁদের তাক্বলীদ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। যেমন-

১- ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা :

(ক) إذا صح الحديث فهو مذهبي 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব'।[১২৬]

(খ) لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه 'আমরা কোথা থেকে গ্রহণ করেছি, তা না জেনে আমাদের কথা গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়'।[১২৭]

(গ) حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي 'যে ব্যক্তি আমার দলীল জানে না, আমার কথা দ্বারা ফৎওয়া প্রদান করা তার জন্য হারাম'।[১২৮]

(ঘ) إننا بشر، نقول القول اليوم، ونرجع عنه غدا 'নিশ্চয়ই আমরা মানুষ। আমরা আজকে যা বলি, আগামীকাল তা থেকে ফিরে আসি'।[১২৯]

(ঙ) ويحك يا يعقوب! لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. 'তোমার জন্য আফসোস হে ইয়াকুব (আবু ইউসুফ)! তুমি আমার থেকে যা শোন তাই লিখে নিও না। কারণ আমি আজ যে মত প্রদান করি, কাল তা প্রত্যাখ্যান করি এবং কাল যে মত প্রদান করি, পরশু তা প্রত্যাখ্যান করি'।[১৩০]

(চ) إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. 'আমি যদি আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথার (হাদীছ) বিরোধী কোন কথা বলে থাকি, তাহ'লে আমার কথাকে ছুঁড়ে ফেলে দিও'।[১৩১]

২- ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা :

(ক) إنما أنا بشر أخطىء وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق فاتركوه- 'আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি ভুল করি, আবার ঠিকও করি। অতএব আমার সিদ্ধান্তগুলো তোমরা যাচাই কর। যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহর অনুকূলে হবে সেগুলো গ্রহণ কর। আর যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিকূলে হবে তা প্রত্যাখ্যান কর'।[১৩২]

(খ) ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার সকল কথাই গ্রহণীয় বা বর্জনীয়, একমাত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত'।[১৩৩]

৩- ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা :

(ক) إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوا ما قلت وفي رواية: فاتبعوها، ولا تلتفتوا إلى قول أحد- 'যদি তোমরা আমার বইয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ বিরোধী কিছু পাও, তাহ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী বল এবং আমার কথাকে প্রত্যাখ্যান কর'। অন্য এক বর্ণনায়

১২৫. *বুখারী, হা/৭৩৫২ 'কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়, 'বিচারক ইজতিহাদে ঠিক করুক বা ভুল করুক তার প্রতিদান পাবে' অনুচ্ছেদ।*
১২৬. *হাশিয়াহ ইবনে আবেদীন ১/৬৩।*
১২৭. *ঐ ৬/২৯৩।*
১২৮. *ড. অছিউল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আব্বাস, আত-তাক্বলীদ ওয়া হুকমুহু ফী যুইল কিতাব ওয়াস-সুন্নাহ, পৃঃ ২০।*
১২৯. *ঐ।*
১৩০. *ঐ।*
১৩১. *ছালেহ ফুল্লানী, ইক্বায়ু হিমাম, পৃঃ ৫০।*
১৩২. *ইমাম ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ৬/১৪৯।*
১৩৩. *ঐ ৬/১৪৫।*

এসেছে, 'তোমরা রাসূল (ছাঃ)-এর কথারই অনুসরণ কর এবং অন্য কারো কথার দিকে দৃকপাত কর না'।[১৩৪]

(খ) كل ما قلت، فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي أولى، فلا تقلدوني. 'আমি যেসব কথা বলেছি, তা যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছের বিপরীত হয়, তবে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছই অগ্রগণ্য। অতএব তোমরা আমার তাক্বলীদ কর না'।[১৩৫]

(গ) كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রত্যেকটি হাদীছই আমার কথা, যদিও আমার নিকট থেকে তোমরা তা না শুনে থাক'।[১৩৬]

৪- ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা :

(ক) لا تقلدني، ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. 'তুমি আমার তাক্বলীদ কর না এবং তাক্বলীদ কর না মালেক, শাফেঈ, আওযাঈ ও ছাওরীর। বরং তাঁরা যে উৎস হ'তে গ্রহণ করেছেন, সেখান থেকে তোমরাও গ্রহণ কর'।[১৩৭]

(খ) من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو على شفا هلكة. 'যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করল, সে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেল'।[১৩৮]

তাক্বলীদের উৎপত্তি :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং ছাহাবীদের যুগে তাক্বলীদ অর্থাৎ কেউ কারো কথা বিনা দলীলে গ্রহণ করতেন না। কুরআন ও হাদীছের মধ্যেও 'তাক্বলীদ' শব্দের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছে অর্থগতভাবে তাক্বলীদ সম্পর্কে যা এসেছে তাও খারাপ অর্থে, ভাল অর্থে নয়।

সর্বপ্রথম 'তাক্বলীদ' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ছাহাবীদের যুগে। ঐ শব্দটি ব্যবহার করে শরী'আতের যাবতীয় বিষয়ে কারো তাক্বলীদ তথা অন্ধ অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر- 'সাবধান! তোমাদের কেউ যেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় দ্বীনের ব্যাপারে কারো তাক্বলীদ না করে, যে (যার তাক্বলীদ করা হয়) ঈমানদার হ'লে সে (মুক্বাল্লিদ) ঈমানদার হয়, আর কাফের হ'লে সেও কাফের হয়। কেননা মন্দ বা খারাপে কোন আদর্শ নেই'।[১৩৯]

বলা হয়ে থাকে, যাদের শরী'আত সম্পর্কে জ্ঞান নেই তাদের উপর তাক্বলীদ করা ওয়াজিব। এই কথাটিও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের যুগে কারো জানা ছিল না। বরং তাঁরা ইসলামের যাবতীয় বিধান দলীলভিত্তিক পালনের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইত্তেবা বা অনুসরণ করেছেন, তাক্বলীদ করেননি। কারণ সাধারণ মানুষ- যাদের শরী'আত সম্পর্কে জ্ঞান নেই, তারাও শুধুমাত্র একজনের ফৎওয়া গ্রহণ করতেন না। বরং স্থান, কাল ও পাত্রভেদে বিভিন্ন সময় বিভিন্নজনের নিকট যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব নিতেন। আর যারা ফৎওয়া প্রদান করতেন তাঁদের মূল ভিত্তি ছিল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। তৎকালীন যুগে কোন মাযহাব ও নির্দিষ্ট ফিক্বহের কিতাব ছিল না। সুতরাং তাঁরা কারো অন্ধানুসারী ছিলেন না। যদি কারো মধ্যে তাক্বলীদ প্রকাশ পেত, অথবা কারো কোন কথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথার বিপরীত হ'ত তাহ'লে অন্যান্য ছাহাবীগণ তার তীব্র প্রতিবাদ করতেন। যেমন-

(١) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اَلْحَيَاءُ لاَ يَأْتِيْ إِلاَّ بِخَيْرٍ. فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ مَكْتُوْبٌ فِي الْحِكْمَةِ: إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِيْنَةً. فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتُحَدِّثُنِيْ عَنْ صَحِيْفَتِكَ.

১. ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'লজ্জাশীলতা কল্যাণ বৈ কিছুই আনয়ন করে না'। তখন বুশায়র ইবনু কা'ব (রাঃ) বললেন, হিকমতের পুস্তকে লিখা আছে যে, কোন কোন লজ্জাশীলতা ধৈর্যশীলতা বয়ে আনে। আর কোন কোন লজ্জাশীলতা এনে দেয় শান্তি ও সুখ। তখন ইমরান (রাঃ) বললেন, আমি তোমার কাছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে (হাদীছ) বর্ণনা করছি। আর তুমি কিনা (তদস্থলে) আমাকে তোমার পুস্তিকা থেকে বর্ণনা করছ?[১৪০]

(٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ لاَ تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ، وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلاَ يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ وَأَنْتَ تَخْذِفُ لاَ أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا.

১৩৪. *ইমাম নববী, আল-মাজমূ, ১/৬৩।*
১৩৫. *ইবনু আবী হাতেম, পৃঃ ৯৩, সনদ ছহীহ।*
১৩৬. *ঐ।*
১৩৭. *ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ২/৩০২।*
১৩৮. *নাছিরুদ্দীন আলবানী, মুকাদ্দামাতু ছিফাতি ছালাতিন নাবী (ছাঃ), পৃঃ ৪৬-৫৩।*
১৩৯. *ইবনু আব্দিল বার্র, জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি ২/৯৮৮।*
১৪০. *বুখারী, হা/৬১১৭ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'লজ্জাশীলতা' অনুচ্ছেদ।*

২. আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করছে। তখন তিনি তাকে বললেন, পাথর নিক্ষেপ কর না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাথর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন অথবা বর্ণনাকারী বলেছেন, পাথর ছোঁড়াকে তিনি অপসন্দ করতেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, এর দ্বারা কোন প্রাণী শিকার করা যায় না এবং কোন শত্রুকেও ঘায়েল করা যায় না। তবে এটা কারো দাঁত ভেঙ্গে ফেলতে পারে এবং চোখ উপফিয়ে দিতে পারে। অতঃপর তিনি আবার তাকে পাথর ছুঁড়তে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনা করছিলাম যে, তিনি পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন অথবা তিনি তা অপসন্দ করেছেন। অথচ (একথা শুনেও) তুমি পাথর নিক্ষেপ করছ? আমি তোমার সঙ্গে কথাই বলব না এতকাল এতকাল পর্যন্ত।[১৪১]

(৩) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ هِيَ حَلاَلٌ. فَقَالَ الشَّامِيُّ إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِىْ نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَ أَمْرُ أَبِىْ يُتَّبَعُ أَمْ أَمْرُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ أَمْرُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

৩. ইবনু শিহাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাকে (ইবনে শিহাব) বলেছেন, তিনি [সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ)] শামের একজন লোকের নিকট থেকে শুনেছেন, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-কে হজ্জে তামাত্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, তা হালাল। তখন সিরীয় লোকটি বললেন, তোমার পিতা (ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব) তা নিষেধ করেছেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, যে কাজ আমার পিতা নিষেধ করেছেন সে কাজ যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পালন করেন, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ অনুসরণযোগ্য, না আমার বাবার নির্দেশ অনুসরণযোগ্য? লোকটি বললেন, বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ অনুসরণযোগ্য। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জে তামাত্তু আদায় করেছেন।[১৪২]

২য় শতাব্দী হিজরীর পরে প্রচলিত তাক্বলীদের আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে বিভিন্ন ইমামের নামে বিভিন্ন তাক্বলীদী মাযহাবের প্রচলন হয়। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'জেনে রাখ, চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর আগের লোকেরা নির্দিষ্ট কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের মুক্বাল্লিদ তথা অন্ধানুসারী ছিল না। কোন সমস্যা সৃষ্টি হ'লে লোকেরা যেকোন আলেমের নিকট থেকে ফৎওয়া জেনে নিত। এ ব্যাপারে কারো মাযহাব যাচাই করা হ'ত না'।[১৪৩] এই উক্তি প্রমাণ করে যে, মাযহাবের তাক্বলীদ শুরু হয়েছে ৪র্থ শতাব্দী হিজরী হ'তে। ওলামায়ে কেরাম-যাদের ইজতিহাদ সর্বত্র গৃহীত হয়েছে, তাঁরা সকলেই তাক্বলীদের বিরোধিতা করেছেন। যেমন- ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির তাক্বলীদ দ্বারা ফৎওয়া প্রদান করা জায়েয নয়। কেননা তাক্বলীদ ইলম নয়। আর ইলমবিহীন ফৎওয়া প্রদান করা হারাম। সকলের ঐক্যমত হ'ল তাক্বলীদের নাম ইলম নয় এবং মক্বাল্লিদের নাম আলেম নয়।[১৪৪] অতএব তাক্বলীদ নয়, কুরআন ও হাদীছের যথাযথ অনুসরণই ইসলামের মৌলিক বিষয়। যেমনটি অনুসরণ করেছেন সালাফে ছালেহীন। তারা কারো মুক্বাল্লিদ ছিলেন না।

প্রসিদ্ধ চার ইমামের সাথে তাঁদের ছাত্রদের অনেক মাসআলায় মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। 'মুখতাছারুত ত্বহাবী' গ্রন্থে অনেক মাসআলাতে ইমাম আবু হানীফার মতের বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপভাবে 'হেদায়াহ' গ্রন্থ প্রণেতা মারগিনানী, 'বাদায়েয়ুছ ছানায়ে' প্রণেতা আল-কাসানী, 'ফাতহুল ক্বাদীর' প্রণেতা কামাল ইবনুল হুমাম প্রমুখ আলেম হানাফী মাযহাবের বড় বড় বিদ্বান ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ইমাম আবু হানীফার অন্ধানুসারী ছিলেন না; বরং কুরআন ও হাদীছ অনুসরণ করতে গিয়ে ইমাম আবু হানীফার অনেক মতকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই ইমাম আবু হানীফার অনুসারী ছিলেন। কেননা তিনি বলেন, إذا صح الحديث فهو مذهبي. 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব'।

অনুরূপভাবে ইবনু কুদামা (রহঃ), শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ), ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ), ইবনু রজব (রহঃ) হাম্বলী মাযহাবের খ্যাতনামা বিদ্বান ছিলেন। আবু ইসহাক আশ-শীরাযী (রহঃ), ইমাম নববী (রহঃ) শাফেঈ মাযহাবের এবং ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ), ইবনু রুশদ (রহঃ), ইমাম শাত্বেবী (রহঃ) মালেকী মাযহাবের বিদ্বান ছিলেন। তাঁদের কেউ কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের অন্ধানুসারী ছিলেন না। বরং তাঁরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করতে গিয়ে তাঁদের ইমামদের বিরুদ্ধে মত পোষণ করতে সামান্যতম দ্বিধাবোধ করেননি।

[চলবে]

১৪১. বুখারী, হা/৫৪৭৯ 'যবেহ ও শিকার' অধ্যায়, 'ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করা ও বন্দুক মারা' অনুচ্ছেদ।
১৪২. তিরমিযী, হা/৮২৪, 'হজ্জ' অধ্যায়, 'হজ্জে তামাত্তু সম্পর্কে যা এসেছে' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ।
১৪৩. শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ ১/১৫২-৫৩ 'চতুর্থ শতাব্দী ও তার পরের লোকদের অবস্থা বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।
১৪৪. ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ২/৮৬।

আল্লাহ্র নিদর্শন

*রফীক আহমাদ**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পৃথিবীর স্থলভাগ, জলভাগ এবং মহাশূন্যের ও ভূগর্ভের বিশাল এলাকা, অসীম আকাশমণ্ডলী, অগণিত তারকারাজি ও ঊর্ধ্বজগতের সব কর্তৃত্ব আল্লাহ্র। মহান আল্লাহ তা'আলা হ'লেন ঐ বিশাল জগত সহ আমাদের অতি ক্ষুদ্র জগতের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক।

পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বৎসরেও আকাশমণ্ডলী, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ইত্যাদি এক ও অভিন্নভাবে সারা বিশ্বের মানব সম্প্রদায়ের সামনে প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ বছরেও শত সহস্র কোটি মানুষ অনুরূপ একটি নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়নি এবং হবেও না কোনদিন। বিশ্বের মানবমণ্ডলী এক আসমান ও সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রের নিদর্শন হ'তেই উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে এক আল্লাহ্র আহ্বানে সাড়া দিতে পারে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিদর্শন সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাঁর প্রতি আনুগত্যশীল ও আত্মসমর্পণকারী হ'তে আদেশ দিয়েছেন। অন্যথা শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার হুমকিও দিয়েছেন। এ শাস্তি আখেরাতের জন্য চিরস্থায়ী। তবে পৃথিবীতে বসবাসকাল হ'তেই তা শুরু হয়ে যেতে পারে। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ্র নিদর্শনকে অস্বীকারকারীদের শাস্তিরও বর্ণনা রয়েছে।

পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত ঐতিহাসিক কাহিনী সমূহ, মূলতঃ উম্মতে মুহাম্মাদীর সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে নাযিল হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'অবশ্য তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা সীমালংঘন করেছিল। অথচ রাসূল তাদের কাছেও এসব বিষয়ের প্রকৃষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তারা ঈমান আনেনি। এভাবে আমি শাস্তি দিয়ে থাকি পাপী বা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে। তারপর তোমরা কি কর তা দেখার জন্য আমি তাদের পরে পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি করেছি' *(ইউনুস ১০/১৩-১৪)*।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'যারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে, তারা যখন আপনার কাছে আসে তখন আপনি বলে দিন, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের পালনকর্তা রহমত করা নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ কোন মন্দ কাজ করে, অনন্তর এরপরে তওবা করে নেয় এবং সৎ হয়ে যায়, তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়। আর এমনিভাবে আমি নিদর্শন সমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি যাতে অপরাধীদের সামনে পথ প্রকাশিত হয়' *(আন'আম ৬/৫৪-৫৫)*।

মূলতঃ পবিত্র কুরআন ও হাদীছের মূল্যবান উপদেশাবলী নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগ ও পরবর্তী সময়কালের জন্য অমূল্য নছীহত হিসাবে সংরক্ষিত। সুতরাং তার ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য শিক্ষার বিষয়। এখান হ'তে শিক্ষালাভ করে যারা বিশ্বাসী হয়, আল্লাহ তাদের প্রতি সদয় হন এবং তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যারা তাঁর এই নিদর্শনাবলীকে বিশ্বাস করে না, তারা পূর্ববর্তীদের মতই বিপদ-আপদ ও সঙ্কটজনক বাস্তবতার সম্মুখীন হয়। এ বিষয়েও উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য শিক্ষণীয় ও সতর্কতামূলক প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِـــنْ نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلاً وَكَفَى بِاللهِ شَهِيْداً–

'আপনার যে কল্যাণ হয়, তা হয় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে। আর আমি আপনাকে পাঠিয়েছি মানুষের প্রতি আমার পয়গামের বাহক হিসাবে। আর আল্লাহ সব বিষয়েই যথেষ্ট, সব বিষয়ই তাঁর সম্মুখে উপস্থিত' *(নিসা ৪/৭৯)*।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيْـــرٍ– 'তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেন' *(শূরা ৪২/৩০)*।

উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির কল্যাণকে তাঁর নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে বান্দার অকল্যাণ, অমঙ্গল বা বিপদ-আপদকে তার কৃতকর্মের ফলাফল বলে অভিহিত করেছেন। এরূপ একটি ইতিহাস যা নবী পূর্ব যুগে সংঘটিত হয়েছিল, তা উল্লেখ করা হ'ল। ঘটনাটি ছিল জনৈক সাধক ব্যক্তির কাণ্ড। পবিত্র কুরআনে নাম উলেখ ছাড়াই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবতীর্ণ হয়েছে। তবে তাফসীরবিদগণের ঐক্যমতে তার নাম ছিল বাল'আম ইবনে বাউরা। সে অত্যন্ত ধর্মভীরু ও আল্লাহভীরু ছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে এক সময় সে এক চক্রান্তকারী দলের কবলে পড়ে পার্থিব জগতের মোহে আবদ্ধ হয়ে যায়। বিষয়টি পবিত্র কুরআনের ভাষায় যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা হ'ল, 'আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন, ঐ লোকের অবস্থা, যাকে আমি নিজের নিদর্শন সমূহ দান করেছিলাম। অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান। ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শন সমূহের বদৌলতে। কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল। সুতরাং তার অবস্থা হ'ল কুকুরের মত, যদি তাকে তাড়া কর তবুও হাঁপাবে, আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এ হ'ল সে সব লোকের উদাহরণ, যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার নিদর্শন সমূহকে। অতএব আপনি বিবৃত করুন এসব কাহিনী, যাতে তারা চিন্তা করে। তাদের উদাহরণ অতি নিকৃষ্ট, যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াত সমূহকে এবং তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করছে' *(আ'রাফ ৭/১৭৫-১৭৭)*।

---

* *শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।*

উপরোক্ত ঘটনাটি আল্লাহ্র নিদর্শনপ্রাপ্ত ব্যক্তির পথভ্রষ্টতার নমুনা হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। সে আল্লাহ্র রহমতে আবৃত ছিল। কিন্তু সে রহমতকে উপেক্ষা করে পার্থিব জগতে আনন্দ ভোগের প্রত্যাশায় শয়তানের আমন্ত্রণে বিবেকের পরিপন্থী পথে ঝাঁপ দিয়ে আল্লাহ্র রহমত হ'তে চিরতরে বঞ্চিত হয়েছিল। মানুষের দৃষ্টির আড়ালে এরূপ বহু কাহিনী আবহমানকাল ধরে চলে আসছে বিশ্বময়। এতদ্ব্যতীত পৃথিবীর বুকে মানব সম্প্রদায়ের অনাচার, অবিচার, বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘনের ফলে পূর্ববর্ণিত পুরাকালের ধ্বংসকাহিনীগুলোর মত কোন ধ্বংসযজ্ঞ বর্তমানে নেই। তবে নবী পরবর্তী যুগেও পূর্বের চেয়ে কিছুটা হাল্কা প্রকৃতির দুর্যোগ মাঝে মাঝে সংঘটিত হয়ে আসছে। অঘোষিত এই সব দুর্যোগের ভয়াবহতা পূর্বের মত না হ'লেও একেবারে কম নয়। এগুলোর মধ্যে ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি, হ্যারিকেন ইত্যাদির আঘাতে মাঝে মধ্যে বিশ্বের এখানে সেখানে হাযার হাযার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারাচ্ছে। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, বিগত একশ' বছরে বিশ্বে প্রায় ১২/১৩টি ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। সেগুলোর ধ্বংসযজ্ঞ ও ক্ষয়-ক্ষতি অবর্ণনীয়। তন্মধ্যে সর্বশেষ ইন্দোনেশিয়ায় গত ২৬শে ডিসেম্বর ২০০৪ইং তারিখের ভূমিকম্পে সৃষ্ট সুনামির ধ্বংসলীলা এক বিস্ময়ের বিষয়। এতে প্রায় ২ লক্ষেরও বেশী লোক প্রাণ হারায় এবং আহত হয় প্রায় ৫০ লক্ষ লোক।

গত ৮ই অক্টোবর ২০০৫ইং তারিখে পাকিস্তানের কাশ্মীর অঞ্চলে মারাত্মক ভূমিকম্পে প্রায় ৫০ হাযারের বেশী লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং কয়েক লক্ষ লোক আহত হয়।

ঐসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে চলছে অহরহ আকস্মিক দুর্ঘটনা। দিবারাত্রির যেকোন সময় যে কোন দেশে উড়োজাহাজে, ট্রেনে, বাসে, ট্রাকে, মোটর সাইকেলে, স্টীমার, লঞ্চে, নৌকায়, কলকারখানায়, মাটির নীচে খনিতে, পথে-ঘাটে, বাড়ীতে সর্বত্রই দুর্ঘটনা কবলিত বহু মৃত্যুর হাতছানি। এসব আল্লাহর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন।

আল্লাহ্র নিদর্শন অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহুল এবং ইসলামের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিগ্রহণের এক অসামান্য জ্ঞানভাণ্ডার। সুতরাং এখান হ'তে লব্ধ জ্ঞান অর্থাৎ আল্লাহ্র অসীম নিদর্শন হ'তে প্রাপ্ত জ্ঞানে আমাদেরকে এক আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর গৃহীত মহাব্যবস্থার মহাবিচারকে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করে সেদিনে পরিত্রাণ লাভের আশায় নেক আমল করতে হবে।

এখানে আল্লাহ্র নিদর্শনে বিশ্বাসী বান্দাদের আনুগত্য বা আত্মসমর্পন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيْهِ إِنَّ اللهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ–

'হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করবেন এতে কোনই সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ওয়াদার অন্যথা করেন না' *(আলে ইমরান ৩/৯)*।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيْهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيْثاً– 'আল্লাহ ব্যতীত আর কোনই উপাস্য নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন ক্বিয়ামতের দিন এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাছাড়া আল্লাহ্র চাইতে বেশী সত্য কথা আর কার হবে' *(নিসা ৪/৮৭)*।

অতঃপর আল্লাহ্র নিদর্শনে অবিশ্বাসী পথভ্রষ্ট বান্দাদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'মানুষ বলে, আমার মৃত্যু হ'লে পর আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব? মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন কিছুই ছিল না। সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম! আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করব, অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করব। অতঃপর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় আল্লাহ্র সর্বাধিক অবাধ্য, আমি অবশ্যই তাকে পৃথক করে নেব। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিক যোগ্য, আমি তাদের বিষয়ে ভালভাবে জ্ঞাত আছি। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌঁছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফায়ছালা। অতঃপর আমি পরহেযগারদের উদ্ধার করব এবং যালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দিব' *(মারিয়াম ১৯/৬৬)*।

ক্বিয়ামত দিবসের অপর এক বর্ণনায় আল্লাহ বলেন, 'সেদিন (ক্বিয়ামতের) আল্লাহ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। এদিন হার-জিতের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তার পাপ সমূহ মোচন করবেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। যার তলদেশে নির্ঝরিণী সমূহ প্রবাহিত হবে, তারা তথায় চিরকাল বসবাস করবে। এটাই মহাসাফল্য। আর যারা কাফের এবং আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে। কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল এটা' *(তাগাবুন ৬৪/৯-১০)*।

উপরের আলোচনা থেকে একটা বিষয় পরিস্কারভাবে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্র নিদর্শন উপলব্ধি করার জন্যই এ ধরণীর বুকে মানব জাতির আগমন হয়েছে, একদিন তা শেষ হয়ে যাবে। ক্বিয়ামত দিবসের বিচার পর্বের পর নিজ নিজ কর্মফল অনুযায়ী চিরস্থায়ী জান্নাত বা জাহান্নাম হবে পৃথিবীবাসীর অনন্তকালের আবাসস্থল।

বলা আবশ্যক যে, জান্নাত ও জাহান্নামের কোন নিদর্শনই মানুষ দেখেনি। কিন্তু তার বর্ণনাভঙ্গী হ'তেই ধর্মপ্রাণ মানুষের বিচলিত হয়ে পড়ে জাহান্নামের ভয়ে এবং জান্নাতে আশ্রয় লাভের আশায় সঠিক পথ অনুসন্ধান করে। এখানে আরও উলেখ্য, পবিত্র কুরআনই আল্লাহ্র নিদর্শনের উৎস। সুতরাং পবিত্র কুরআনের আলোকে জীবন গড়ার ব্রত গ্রহণ করাই মানব জাতির শ্রেষ্ঠ পথ ও পাথেয়। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

অর্থনীতির পাতা

বাংলাদেশের দারিদ্র্য সমস্যা : কারণ ও প্রতিকার

*ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী**

উপক্রমণিকা :

দারিদ্র্য এক নির্মম অভিশাপ। এ অভিশাপ মানুষকে কুঁরে কুঁরে খায়। সমাজ-সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়ার পরিবর্তে পিছিয়ে দেয়। এটা মানবতাকে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে দিতে পারে। দারিদ্র্যের কশাঘাতে ও ক্ষুধার নির্মম যাতনায় অভাবের অনলে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে ন্যায়-অন্যায় বিস্মৃত বনু আদম পাপ-পঙ্কিলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে নিজের অজান্তেই আত্মবিধ্বংসী পথে অগ্রসর হয়। দারিদ্র্যের এ নির্মম কঠোর জ্বালায় মানবতাবোধ লোপ পায়, হিংস্রতার প্রসার ঘটে, অন্যায়-অবিচার বিস্তৃত হয়। নারী তার পরম সযত্নে লালিত সতীত্বকে বিলিয়ে দেয়, মানুষ তার কলিজার টুকরা সন্তান বিক্রি করে, এমনকি হত্যা পর্যন্ত করতেও দ্বিধা করে না।

দারিদ্র্য হ'ল রক্তশূন্যতা সদৃশ। অর্থ-সম্পদ মানুষের জন্য সে কাজ করে, যা মানুষের দেহের জন্য রক্ত করে। রক্ত মানুষের দেহ ও জীবনের স্থিতির নিয়ামক। রক্তশূন্যতা দেখা দিলে মানুষের দেহ নানা দুরারোগ্য ব্যাধির আবাসে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে সম্পদের স্বল্পতা থাকলে মানুষের জীবনও অচল হয়ে পড়ে অনিবার্যভাবে।

'দারিদ্র্য' ও 'বাংলাদেশ' শব্দদ্বয় একত্রে বিসদৃশ লাগে। কারণ বাংলাদেশ একটি অপার সম্ভাবনার দেশ। সম্পদে ভরপুর দেশটির স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন সময়ে ছুটে আসা পর্যটক, বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী-গুণী ও ভূ-তত্ত্ববিদগণ। অথচ বর্তমানে আমাদের দেশে মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৪ কোটি ৬৭ লাখ ৮৯ হাযার ৭৭২ জন। যা শতকরা ৩১ দশমিক ৫ ভাগ এবং অতি দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ২ কোটি ৬০ লাখ ৬৫ হাযার ১৭১ জন, যা শতকরা ১৭ দশমিক ৬ ভাগ। প্রকৃতপক্ষে আমরা দরিদ্র নই; বরং আমাদেরকে দরিদ্র করে রাখা হয়েছে। আমাদের শাসকবৃন্দ হ'লেন এর প্রধান কুশীলব। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা পরিপন্থী কর্মনীতি ও কর্মপন্থা তথা ইসলাম পরিপন্থী অর্থব্যবস্থা ও কর্মকাণ্ডই এ দারিদ্র্য সমস্যার মূল কারণ। কেননা দারিদ্র্য ও ইসলাম শব্দ দু'টি দুই মেরুর শব্দ। সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব যেমন চিরন্তন, ঠিক তেমনি দারিদ্র্য ও ইসলামের দ্বন্দ্বও চিরন্তন। ইসলাম ও দারিদ্র্যের সহাবস্থান অকল্পনীয়। যে 'জাযীরাতুল আরবে'র (আরব উপদ্বীপ) মানুষেরা অভাব ও দারিদ্র্যের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে কয়েকদিন পর্যন্ত উপোস থেকে উদরে পাথর বেঁধে দিনাতিপাত করত, সেই আরব জাতি ইসলামের সুমহান আদর্শে বলীয়ান হয়ে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এমন স্বনির্ভর দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত জাতি হ'তে সক্ষম হয়েছিল যে, যাকাত নেওয়ার মতো কোন লোক সেখানে পাওয়া যেত না। ডঃ হাম্মূদাহ আবদালাতি বলেন, It is authentically reported that there were times in the history of the Islamic administration when there was no person eligible to receive Zakah. 'ইসলামী সোনালী শাসনামলের ইতিহাসে এমন এক সময় ছিল, যখন যাকাত গ্রহণ করার মতো কোন লোক ছিল না'।[১৪৫]

দারিদ্র্যের সংজ্ঞা :

দারিদ্র্যের অর্থ হচ্ছে- দরিদ্র অবস্থা, অভাব ও দীনতা।[১৪৬] দারিদ্র্য বলতে এমন ব্যক্তি বা দেশকে বুঝায় যার সামান্য সম্পদ ও অল্প আয় রয়েছে, যা দ্বারা ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন (Basic Needs) মেটাতে ব্যর্থ।[১৪৭] ডেলটুসিং বলেন, 'মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদের অপ্রতুলতাই হ'ল দারিদ্র্য'।[১৪৮] থিওডরসনের মতে, 'দারিদ্র্য হ'ল প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক উপোস'।[১৪৯] ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য হচ্ছে এমন এক অবস্থা, যা মানব জীবনের অব্যাহত প্রয়োজনীয় পণ্য বা মাধ্যম উভয়েরই অপর্যাপ্ততা বুঝায়।[১৫০]

দারিদ্র্যের কারণ ও প্রতিকার :

দারিদ্র্য সমস্যার কারণের মাঝেই তার প্রতিকার নিহিত আছে। তাই বাংলাদেশের দারিদ্র্য সমস্যার কারণ বিশ্লেষণের সাথে সাথেই তার প্রতিকার বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

১. সম্পদের মালিকানা :

বাংলাদেশ ৯০% মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ বিত্তশালী নিজেদেরকে তাদের সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক মনে করে সম্পদ নিজ আয়ত্বে কুক্ষিগত করে রাখেন। অভাবগ্রস্ত দারিদ্র্যপীড়িত আর্ত-মানবতার সেবায় তারা কোনই অর্থ ব্যয় করেন না। আর এটা বাংলাদেশের দারিদ্র্য সমস্যার অন্যতম কারণ। মালিকানার ধারণা মানুষের মাঝে স্বেচ্ছাচারিতা ও লাগামহীনতার জন্ম দেয়। শোষণের মূলে রয়েছে মানুষের এ স্বেচ্ছাচারী মানসিকতা। মালিক যখন নিজেকে নিরঙ্কুশ মালিকানার অধিকারী মনে করে, তখন তাকে أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক' *(নাযি'আত ২৪)*-এ ধরনের ফেরাঊনী অলীক ভাবনায় পেয়ে

* *প্রধান মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।*

১৪৫. মোঃ এনামুল হক, যাকাত : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল-জুন ২০১০ ইং), পৃঃ ১৫৭।
১৪৬. সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, পৃঃ ২৭৭।
১৪৭. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, প্রবন্ধঃ দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৯ইং, পৃঃ ৯৩।
১৪৮. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত, পৃঃ ৯৪।
১৪৯. ঐ।
১৫০. ঐ।

বসে। ইসলাম তাই বান্দার নিরঙ্কুশ মালিকানার ধারণা রহিত করে দিয়ে শুরুতেই শোষণবাদী মানসিকতার মূলোৎপাটন করে দেয়। মূলতঃ সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিকানা আল্লাহ্‌র। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী- لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ 'আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র' *(বাক্বারাহ ২৮৪)*। সম্পদে আল্লাহ্‌র মালিকানার বিশ্বাস মানুষকে স্বভাবতই বিনয়ী, জবাবদিহিতার চেতনায় উদ্ভাসিত এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অর্থ ব্যয়ে উদ্বুদ্ধ করে।

২. দারিদ্র্য সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদা :

আমাদের দেশের একশ্রেণীর আলেম-ওলামা, শ্রমবিমুখ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী দারিদ্র্যকে সযত্নে লালন করে চলছেন। তারা الفقر فخري وبه أفتخر 'দারিদ্র্য আমার অহংকার। এর দ্বারাই আমি গর্ববোধ করি' মর্মে একটি জাল হাদীছ[১৫১] উদ্ধৃত করে নিজেদের দারিদ্র্য সম্পর্কিত ভ্রান্ত আক্বীদার সাফাই গেয়ে থাকেন। অথচ তারা জানেন না যে, যারা আল্লাহ্‌র বিধানাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, মূলতঃ তারাই দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্টে নিপাতিত হয়। এ প্রসঙ্গে রাব্বুল আলামীনের বাণী, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا. 'যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবিকা হবে সংকুচিত' *(ত্ব-হা ১২৪)*। রাসূল (ছাঃ) সর্বদা দো'আয় বলতেন, اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ- 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের শাস্তি ও ফিতনা, কবরের ফিতনা ও আযাব, প্রাচুর্য, দারিদ্র্য ও দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি'।[১৫২] তিনি আরো বলতেন, اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ. 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষুধা থেকে পানাহ চাচ্ছি। কেননা তা সবচেয়ে নিকৃষ্ট সঙ্গী এবং তোমার নিকট খিয়ানত থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। কেননা তা সবচেয়ে নিকৃষ্ট সঙ্গী'।[১৫৩]

৩. শ্রমবিমুখতা :

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, Diligence is the key to success. 'পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি'। পক্ষান্তরে শ্রমবিমুখতাই দারিদ্র্যের মূল কারণ। শ্রমই দারিদ্র্য বিমোচনের প্রথম হাতিয়ার এবং ভাগ্যোন্নয়নের প্রধান মাধ্যম। কিন্তু আমাদের এ দেশের অধিকাংশ মানুষ শ্রমবিমুখ, আরামপ্রিয়, অলস। তারা নিম্ন পেশার কাজ করতে লজ্জাবোধ করে। তাই দারিদ্র্যের যাতাকলে আমরা আজও নিষ্পেষিত। শ্রমবিমুখতাকে ইসলাম পসন্দ করে না। ছালাত শেষে অলসভাবে মসজিদে বসে না থেকে রিযিক অন্বেষণের লক্ষ্যে যমীনে ছড়িয়ে পড়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে- فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ- 'ছালাত সমাপ্ত হ'লে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (রিযিক) অন্বেষণ কর' *(জুম'আ ১০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ أَنْ يَّأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ. 'নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা অধিক উত্তম খাদ্য আর কিছুই নেই'।[১৫৪] যদি আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর উপরোক্ত দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হ'তাম, তবে এ দেশে দারিদ্র্য সমস্যা থাকত না।

৪. মালিক ও শ্রমিকের দায়িত্বহীনতা :

মালিক-শ্রমিকের দায়িত্বহীনতাও দারিদ্র্য সমস্যার জন্য কম দায়ী নয়। কারণ এ দেশের মালিক-শ্রমিকের কেউ নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয়। এ ব্যাপারে তারা একেবারেই উদাসীন বললেও অত্যুক্তি হবে না। শ্রমিকের কর্তব্য হ'ল তার উপর আরোপিত দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে আঞ্জাম দেয়া আর মালিকের কর্তব্য হ'ল শ্রমিকের যথার্থ মজুরী নির্ধারণ করা, সময়মত তা পরিশোধ করা এবং অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে না দেয়া।

আদর্শ শ্রমিকের পরিচয় সম্পর্কে রাব্বুল আলামীনের বাণী- إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ- 'শ্রমিক হিসাবে সেই উত্তম যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত' *(ক্বাছাছ ২৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে। তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হ'ল, وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ، 'যে ক্রীতদাস আল্লাহ্‌র হক আদায় করে এবং স্বীয় মালিকের হকও যথার্থভাবে আদায় করে'।[১৫৫] অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মালিকদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهُ. 'শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকাবার আগেই

---

১৫১. *ছাগানী, আল-মাওযূ'আত ১/৫২ পৃঃ, হা/৭৭; হাফেয সাখাবী, আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ হা/৭৪৫।*
১৫২. *বুখারী, হা/৬৩৭৬ 'দো'আ' অধ্যায়, 'প্রাচুর্যের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা' অনুচ্ছেদ।*
১৫৩. *নাসাঈ, মিশকাত হা/২৪৬৯, হাদীছ হাসান ছহীহ।*
১৫৪. *বুখারী, মিশকাত হা/২৭৫৯।*
১৫৫. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১।*

তার প্রাপ্য মজুরী দিয়ে দাও'।[১৫৬] হাদীছে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ক্বিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হব। তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হ'ল, وَرَجُــلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْراً، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْــرَهُ. 'যে ব্যক্তি মজুরীতে মজুর রেখে তার কাছ থেকে পূর্ণ শ্রম গ্রহণ করেছে, অথচ তার ন্যায্য মজুরী প্রদান করেনি'।[১৫৭]

উপরোক্ত ইসলামী দিকনির্দেশনা না মানার কারণেই মালিক-শ্রমিক অসন্তোষ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ফলশ্রুতিতে অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কর্মহীন বেকার হয়ে দারিদ্র্যের অতলতলে তলিয়ে যাচ্ছে হাযারো পরিবার, যার বাস্তব দৃষ্টান্ত হ'ল দেশের গার্মেন্টস শিল্প।

৫. সুষম বণ্টন ব্যবস্থার অভাব :

ধন-সম্পদে ভরপুর আমাদের এ বাংলাদেশ। তাই এ দেশকে বলা হয় সোনার বাংলাদেশ। তদুপরি এ দেশের প্রায় ৩১ দশমিক ৫ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য সমস্যার মূল কারণ এই নয় যে, পৃথিবীতে সম্পদের অভাব। বরং আসল কারণ হচ্ছে সুষ্ঠু ব্যয় ও বণ্টনের অভাব। ইসলাম সম্পদ বণ্টনের মূলনীতি হিসাবে নির্দেশ দিয়েছে, –كَيْ لاَ يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ 'ধন-সম্পদ যেন শুধু তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই আবর্তিত হ'তে না থাকে' *(হাশর ৭)*। অর্থাৎ ইসলাম চায় ধন-সম্পদ শুধু সমাজের মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর মাঝে আবর্তিত না হয়ে গোটা সমাজে আবর্তিত হোক। সমাজের প্রত্যেকটি সদস্য ধন-সম্পদ দ্বারা উপকৃত হোক। এজন্য ইসলাম ইনছাফভিত্তিক শ্রমনীতির ব্যবস্থা করেছে। ধন অর্জনের শোষণমূলক ও অনৈতিক পন্থা যেমন চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, জুয়া, সূদ, ঘুষ, মজুদদারী, প্রতারণা, ওযনে কম দেয়া, ভেজাল ইত্যাদি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। ধন-সম্পদ বংশানুক্রমিক মুষ্টিমেয় লোকদের হাতে কুক্ষিগত হওয়া বন্ধ করার লক্ষ্যে প্রবর্তন করেছে ব্যাপকভিত্তিক উত্তরাধিকার আইন। চালু করেছে নফল দান-ছাদাক্বাহ ও সহযোগিতার ব্যবস্থা। রয়েছে করযে হাসানার মতো মানবহিতৈষী নিঃস্বার্থ ঋণদান ব্যবস্থাও।

৬. যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার অনুপস্থিতি :

আমাদের এ দেশ ৯০% মুসলিম অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তি পর্যায়ে কিছুটা যাকাত দেওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে বটে, কিন্তু যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু নেই। আর এটা দারিদ্র্য সমস্যার অন্যতম কারণ। যাকাতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার দারিদ্র্য বিমোচন, যা সামাজিক নিরাপত্তার মূল চালিকাশক্তি। যাকাত বণ্টনের ৮টি খাতের মধ্যে ৪টি খাতই (ফকীর, মিসকীন, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত) অসহায় অভাবগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য নিবেদিত। এছাড়া নব মুসলিমের ভাগটাও বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে এর মধ্যে আসতে পারে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি যাকাত। এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অর্থ ক্ষুধা-দারিদ্র্য, সন্ত্রাস-নৈরাজ্য, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, হতাশা, শ্রেণীবৈষম্য, অসহনশীলতা, অনৈক্য, দুশ্চিন্তামুক্ত পারস্পরিক সহযোগিতা-সহমর্মিতা এবং কল্যাণ কামনার বুনিয়াদে সকল সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য দূর হয়ে সাম্য-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্ব ও কল্যাণময়তা বিরাজ করা। পরস্পর এগিয়ে এসে একে অপরের দুঃখ-দুর্দশা মোচন করা। যে সমাজ আমাদের কাছে স্বপ্নের সোনার হরিণ, আজকের আধুনিক ধনতান্ত্রিক বিশ্ব যে সমাজের কথা কল্পনাও করতে পারে না, সে সমাজ উপহার দিয়েছে ইসলাম এখন থেকে প্রায় পনেরশত বছর আগে। যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা ছিল যে সমাজের সকল আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। যাকাত দুস্থ-দরিদ্রদের প্রতি বিত্তশালীদের দয়া বা অনুকম্পা নয় বরং অধিকার। এ প্রসঙ্গে রাব্বুল আলামীনের বাণী, وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ 'আর তাদের (বিত্তশালীদের) সম্পদে রয়েছে দরিদ্র ও বঞ্চিতের অধিকার' *(যারিয়াত ১৯)*।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের ব্যাংক, বীমা, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থ থেকে এবং বিত্তশালীদের থেকে যদি বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত আদায় করা হয় তাহ'লে বার্ষিক ৩,০০০ কোটি টাকা যাকাত আদায় করা সম্ভব, যা প্রায় জাতীয় বাজেটের সমপরিমাণ।[১৫৮] এ অর্থ দিয়ে মাত্র পাঁচ বছরেই বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করা সম্ভব। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী তাইতো বলেছেন, 'যাকাত দু'টি লক্ষ্যে নিবেদিত- আত্মশুদ্ধি অর্জন (تهذيب الــــنفس) ও সামাজিক দারিদ্র্য নিরসন'।[১৫৯]

৭. সূদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা :

দারিদ্র্য সমস্যার অন্যতম কারণ হ'ল সূদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। সূদ মানব সভ্যতার সবচেয়ে নিষ্ঠুর শত্রু। সূদ মানুষকে শোষণের অর্থনৈতিক হাতিয়ার। সূদের প্রভাবে মানুষের শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই দেখা দেয় তা নয়, বরং নৈতিক ও চারিত্রিক সর্বোপরি মানবিক বিপর্যয়ও সৃষ্টি হয়। একদিকে সূদের নিষ্পেষণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্রমেই দরিদ্র থেকে আরও দরিদ্র হ'তে থাকে। অপরদিকে পুঁজিপতি বিত্তশালীরা সূদ গ্রহণ করে আরও ধনী হ'তে হ'তে নৈতিক, চারিত্রিক ও মানবিক গুণশূন্য অর্থগৃধ্নুতে পরিণত হয়। তাই রাব্বুল

---

১৫৬. ইবনু মাজাহ হা/২৪৪৩; মিশকাত হা/২৯৮৭, হাদীছ ছহীহ।

১৫৭. বুখারী, মিশকাত হা/২৯৮৪।

১৫৮. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুষম বণ্টনের কৌশল হিসাবে যাকাত : তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, নূরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল '০৯ ইং), পৃঃ ২৩১।

১৫৯. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইল উলূম, ৩য় সংস্করণ, ১৪২০ হিঃ/১৯৯৯ খৃঃ), ২/১০০-১০১।

আলামীন সূদকে চিরতরে হারাম ঘোষণার সাথে ব্যবসাভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালুর তাকীদ দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে, أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। সূদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে দারিদ্র্য সৃষ্টি হয়, পক্ষান্তরে যাকাত, দান-ছাদাক্বা ভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দারিদ্র্য বিমোচন হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. 'আল্লাহ তা'আলা সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-ছাদাক্বাকে বর্ধিত করেন' *(বাক্বারাহ ২৭৬)*।

৮. দারিদ্র্যকে লালন করা হচ্ছে :

বাংলাদেশের দারিদ্র্য সমস্যার আর এক বিশেষ কারণ হচ্ছে- এ দেশের শাসকগোষ্ঠী, রাজনৈতিক নেতা, ক্যাডার, সরকারী আমলা, এনজিও, বিদেশী দাতা সংস্থা কর্তৃক দারিদ্র্যকে লালন করা হচ্ছে। সরকার থেকে শুরু করে এনজিও পর্যন্ত সকলেরই কথার ফুলঝুরি হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন। এজন্য প্রতিবছর 'দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র' (PRSP)-এর আওতায় বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি, দেশী-বিদেশী বিভিন্ন এনজিও ও অন্যান্য দাতাগোষ্ঠীর নিকট থেকে এ দেশে প্রতিবছর আসছে হাযার হাযার কোটি টাকা। সরকারী বাজেটের এক বৃহদংশ বরাদ্দ থাকছে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য। ব্যাংকগুলোও যথেষ্ট না হ'লেও দরিদ্রদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করছে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে সকলেরই লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন। তারপরেও কেন দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে না?

অভিযোগ রয়েছে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রাপ্ত অর্থের অধিকাংশই চলে যায় মন্ত্রী, এমপি, রাজনৈতিক নেতা, সরকারী আমলা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, এনজিও মালিক-কর্মকর্তাদের পকেটে। আর বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফসহ অন্যান্য দাতাগোষ্ঠীও কি আদতে চায় যে, এদেশের দরিদ্রতা দূর হোক? সুশাসন ও সুষ্ঠু আইন-শৃংখলা কায়েম হোক? এ দেশ স্বনির্ভর হোক? নাকি মুখে মুখে সুবচন ঝাড়লেও তারাও মনে মনে চায়, দুর্নীতিবাজ, দেশপ্রেমহীন, মূল্যবোধহীন, চরিত্রহীন রাজনীতিবিদ, আমলা, এনজিও মালিক ও তথাকথিত ব্যবসায়ী শিল্পপতিরাই বহাল থেকে তাদের তল্পিবহন করুক? তাদের দাস্যবৃত্তি করুক? এদেশে মওজুদ থাকুক সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী দেশপ্রেমহীন চরিত্রহীন অথচ শক্তিশালী ও ধনবান একটি দালাল শ্রেণী?[১৬০] মূলতঃ পরকালীন জবাবদিহিতার ভয় না থাকলে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ বলেন, اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ- 'আমি আজ তাদের মুখে মোহর এঁটে দিব। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা সমূহ তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে' *(ইয়াসীন ৬৫)*।

৯. এনজিও কর্তৃক দারিদ্র্য চাষ :

এদেশের এনজিওগুলি- যাদের ঘোষিত লক্ষ্য হ'ল দারিদ্র্য বিমোচন, তারাই দারিদ্র্য চাষ করছে বলে ঘোরতর ও প্রবল সমালোচনা শুরু হয়েছে। বস্তুতঃ এনজিওগুলো যে ক্ষুদ্রঋণ দেয় এবং তার জন্য যে পরিমাণ সূদ শেষাবধি গ্রাহককে পরিশোধ করতে হয়, তাতে 'লাভের গুড় পিঁপড়ায় খায় না; বরং মূল উপার্জনেরই একটা অংশ তুলে দিতে হয় নতুন এই বেনিয়াদের হাতে।[১৬১]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলী খান গত ১৮ অক্টোবর এক সেমিনারে বলেছেন, 'ক্ষুদ্রঋণ ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক চিন্তার আধুনিক সংস্করণ মাত্র। প্রতিবছর দেশের প্রায় ১ কোটি জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্রঋণের প্রতারণার শিকার হয়ে সর্বস্ব হারাচ্ছেন। এ ধরনের কোন প্রকল্পের মাধ্যমে কখনোই দেশকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়'।[১৬২] অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহীত এনজিও ঋণের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, 'চোরাবালিতে আটকা পড়ে যাচ্ছেন ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতারা'। বর্তমানে দেশে ক্ষুদ্রঋণ নিচ্ছেন ৪ কোটি দরিদ্র মানুষ। এত ক্ষুদ্রঋণ দেয়ার পরও কেন পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না, তা খতিয়ে দেখা দরকার। ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে বছরে প্রায় ১২ হাযার কোটি টাকা লেনদেন হয়। বর্তমানে প্রায় ২০ হাযার প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ দিচ্ছে। অর্থমন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণের সূদের হার ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত।[১৬৩] অথচ রপ্তানী খাতে শিল্পপতিদের ঋণ দেয়া হচ্ছে মাত্র ১০ শতাংশ সূদে। যেখানে দরিদ্রদেরকে বিনা সূদে ঋণ দেয়া উচিত ছিল, সেখানে শিল্পপতি কোটিপতিদের চেয়ে দরিদ্রদের নিকট থেকে নেয়া হচ্ছে ৪ গুণ বেশী সূদ! এটা দারিদ্র্য চাষ নয় তো কি?

ইসলাম অতি দরিদ্রদের মাঝে 'করযে হাসানা' তথা সূদমুক্ত ঋণ প্রদানের তাকীদ দিয়েছে। এরশাদ হচ্ছে, إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ. 'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে তিনি তা তোমাদের জন্য বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল' *(তাগাবুন ১৭)*।

[চলবে]

১৬০. *হারুনুর রশীদ, 'স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবৎ মাথাপিছু ২৮ হাযার টাকার ঋণ ও অনুদান' মাসিক আত-তাহরীক, আগষ্ট ২০০৩, পৃঃ ২২-২৩।*

১৬১. *শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, সূদ হারামের অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা, মাসিক আত-তাহরীক, নভেম্বর '০৪ইং, পৃঃ ২৫।*

১৬২. ইনকিলাব, ১৯ অক্টোবর ২০১১, পৃঃ ১৫ ও ১৬।

১৬৩. *দৈনিক যুগান্তর, ৭ নভেম্বর ২০১০ইং।*

হাদীছের গল্প

আব্দুল্লাহ ইবনু সালামের ইসলাম গ্রহণ

উপস্থাপনা : বিশিষ্ট ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম ইসলামকে সঠিক দ্বীন হিসাবে জানার পর ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং নিজেকে মুসলিম হিসাবে তাঁর জাতির কাছে পেশ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছ-

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং তাঁর সাথীরা অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে যখন মদীনায় এসে পৌছলেন, তখন মদীনায় প্রচার হ'ল আল্লাহ্র নবী এসেছেন। লোকেরা উঁচু জায়গায় উঠে দেখতে লাগল আর উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল, আল্লাহ্র নবী এসেছেন। নবী করীম (ছাঃ) বরাবর সামনের দিকে এগুতে লাগলেন। অবশেষে আবু আইয়ুব আনছারীর বাড়ীর নিকটে এসে অবতরণ করলেন। আবু আইয়ুব আনছারী তখন তার পরিবারের লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। এ সময়ে আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম নবী করীম (ছাঃ)-এর আগমনের খবর শুনতে পেলেন।

তিনি এসময়ে তার বাগানে খেজুর পাড়ছিলেন। খবর শুনেই তিনি পাড়া খেজুরগুলো তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে তা সাথে করেই নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে চলে আসলেন এবং নবী (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত কিছু কথাবার্তা শুনে আবার ঘরে ফিরে গেলেন। নবী করীম (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের লোকদের মধ্য কার বাড়ী এখান থেকে অধিকতর নিকটে। আবু আইয়ুব আনছারী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি অধিক নিকটে। এই যে আমার বাড়ি আর এটা আমার বাড়ির দরজা। তিনি বললেন, যাও, আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। আবু আইয়ুব আনছারী বললেন, আল্লাহ বরকত দান করুন আপনারা চলুন। তারপর নবী করীম (ছাঃ) যখন আবু আইয়ুবের ঘরে পৌছলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম আবার আসলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল! আপনি সত্য দিন নিয়ে এসেছেন। ইহুদী সম্প্রদায় খুব ভালভাবেই জানে যে, আমি তাদের নেতা এবং তাদের নেতার ছেলে। আমি তাদের মধ্যে বড় আলেম এবং বড় আলেমের ছেলে। আপনি তাদেরকে ডাকুন এবং আমার ইসলাম গ্রহণের খবরটা তারা জানার পূর্বেই আমার সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করুন। কেননা তারা যদি জানতে পারে যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি তাহ'লে তারা আমার ব্যাপারে এমন সব কথা বলবে যা আমার মধ্যে নেই। তখন নবী (ছাঃ) তাদেরকে ডেকে পাঠান। তারা এসে নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে হাযির হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা ধ্বংসের মুখোমুখি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর। সেই সত্তার কসম! যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল এবং হক দিন নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। সুতরাং তোমরা মুসলিম হয়ে যাও। তারা বলল, আমরা এটা জানি না। একথা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে তারা তিনবার বলল। নবী (ছাঃ) বললেন, আচ্ছা বলতো, আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম তোমাদের মাঝে কেমন লোক? তারা বলল, তিনি তো আমাদের নেতার ছেলে এবং আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ আলেম ও শ্রেষ্ঠ আলেমের ছেলে। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আচ্ছা বলতো যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে কেমন হবে? তারা বলল, আল্লাহ না করুন, তিনি কিছুতেই ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি আবার বললেন, সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে? তারা বলল, আল্লাহ না করুন। তিনি কখনো ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি পুনরায় বললেন, আচ্ছা বলতো, সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে? তারা বলল, আল্লাহ না করুন তিনি কখনো ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন না। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে ইবনু সালাম! একটু এদের সামনে এসো। তিনি বেরিয়ে এলেন এবং ইহুদীদেরকে বললেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! আল্লাহকে ভয় কর। সেই সত্তার কসম! যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, ইনি আল্লাহ্র রাসূল এবং তিনি সত্য দিন নিয়ে এসেছেন। একথা শুনে তারা বলে উঠল, তুমি মিথ্যাবাদী। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিলেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৬২১)*।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মদীনা আগমনের খবর আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের নিকট পৌছলে তিনি এসে নবী করীম (ছাঃ)-কে কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, আমি আপনাকে এমন তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করব যা নবী ছাড়া আর কেউ জানে না- (এক) ক্বিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত কি? (দুই) জান্নাতবাসীগণ সর্বপ্রথম কোন খাদ্য খাবে? (তিন) কিসের কারণে সন্তান (আকৃতিতে কখনো) তার পিতার অনুরূপ হয়, আবার কখনো মায়ের মত হয়? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জিবরাঈল এইমাত্র আমাকে বলে গেলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম বলেন, ফেরেশতাদের মধ্যে তিনিই তো ইহুদীদের শত্রু। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ক্বিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত হ'ল আগুন, যা মানুষকে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে নিয়ে সমবেত করবে। আর জান্নাতবাসীগণ সর্বপ্রথম যে খাদ্য খাবে তা হ'ল মাছের কলিজার অতিরিক্ত টুকরো, যা কলিজার সাথে লেগে থাকে। আর সন্তানের ব্যাপারটা হ'ল এই- নারী-পুরুষের মিলন কালে যদি নারীর আগে পুরুষের বীর্যপাত ঘটে তবে সন্তান বাপের অনুরূপ হয়, আর যদি পুরুষের আগে নারীর বীর্যপাত ঘটে তবে সন্তান মায়ের আকৃতি ধারণ করে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তিনি বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! ইহুদীরা এমন একটি জাতি যারা অপবাদ রটনায় অত্যন্ত পটু। কাজেই আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তারা জ্ঞাত হবার আগে আপনি আমার ব্যাপারে তাদের নিকট জিজ্ঞেস করুন। তারপর ইহুদীরা এলে নবী করীম (ছাঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম কেমন লোক? তারা বলল, তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির ছেলে। তিনি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির ছেলে। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আচ্ছা আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে কেমন ব্যক্তি হবে? তারা বলল, আল্লাহ তাকে এ থেকে রক্ষা করুন। তিনি পুনরায় একথা বললেন। তারাও সেই একই জবাব দিল। এমন সময় আব্দুল্লাহ ভেতর থেকে তাদের সামনে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। তখন তারা বলতে লাগল, এ লোকটা আমাদের মধ্য সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তির ছেলে। তারপর তারা তাকে খুব হেয় প্রতিপন্ন করল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাদের ব্যাপারে আমি এটাই আশংকা করছিলাম *(ছহীহ বুখারী হা/৩৩২৯)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু সালামের মর্যাদা : সা'দ ইবনু আবি ওয়াককাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম ছাড়া ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল (অর্থাৎ জীবিত) কোন লোকের উদ্দ্যেশ্যে আমি নবী (ছাঃ)-কে এ কথা বলতে শুনিনি, নিশ্চয়ই সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। রাবী বলেন, তার সম্পর্কে (সূরা আহকাফের) এ আয়াতটি নাযিল হয়, وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ (احقـــاف ١٠) কুরআন আল্লাহ্র নিকট থেকে আগত এ বিষয়ে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে থেকেও একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছে *(ছহীহ বুখারী হা/৩৫২৮)*।

ইলিয়াস বিন আলী আশরাফ
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

চিকিৎসা জগৎ

পানির বিস্ময়কর গুণ

পানি তৃষ্ণা মেটায়। শরীরের বেশিরভাগ অংশই পানি। এছাড়া কয়েকটি অবাক হওয়ার মতো কাজ করে পানি। যেমন- (১) **স্লিম রাখে :** ওযন কমাতে চাইলে বেশি করে পানি পান করতে হবে। পানি অন্যান্য খাবারের পরিপাক ও শ্বসন (মেটাবলিজম) ত্বরান্বিত করে। একই সঙ্গে পানি খেলে পেট ভরে যায় বলে খাবার গ্রহণের পরিমাণ কমে যায়। ওযন কমানোর জন্য ঠাণ্ডা পানি বেশি কার্যকর বরফঠাণ্ডা পানি খেলে মেটাবলিজম বাড়ে। কারণ এই ঠাণ্ডা পানিকে শরীরের তাপমাত্রায় আনতে শরীরকে বাড়তি কাজ করতে হয়। এতে ক্যালোরি ক্ষয় হয়, ওযন কমাতে যা সবচেয়ে বেশি দরকার। (২) **শক্তি জোগায় :** শরীরে যখন ডিহাইড্রেশন বা পানিশূন্য হয়, তখন কোষগুলো পর্যাপ্ত পানি পায় না। ফলে পুরো শরীরটাই দুর্বল হয়ে পড়ে। পানি পেলে যেমন বাগানের গাছগুলো সজীব হয়, তেমনি শরীরও সজীব হয়। পানি কমে গেলে শরীরে রক্তের পরিমাণও কমে যায়। ফলে কোষে অক্সিজেন ও নুন (মিনারেল) কমে যায়। পানির পরিমাণ ঠিক থাকলে অক্সিজেন ও মিনারেল পেতে কোষের কোন সমস্যা হয় না। (৩) **মানসিক চাপ কমায় :** মস্তিষ্কের ৮৫ শতাংশই পানি। যখন মস্তিষ্ক পানিশূন্য হয়, স্বাভাবিকভাবেই মস্তিষ্কের সকল কর্মকাণ্ডে ভীষণ চাপ পড়ে। তৃষ্ণা পেলেই বুঝতে হবে মস্তিষ্কে পানির ঘাটতি পড়েছে। কথায় বলে, ভয়ে গলা শুকিয়ে যায়। মানে হচ্ছে, ভয় পেলে মস্তিষ্ক তার স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না, তৃষ্ণার মাধ্যমে শরীরকে জানিয়ে দেয় তার পানির প্রয়োজন। কোন চাপ অনুভূত হ'লেই, তা পরীক্ষা হোক বা ব্যবসা-চাকরির টেনশনই হোক, বেশি করে পানি পান করতে হবে। তাহ'লে চাপ কমে যাবে এবং মস্তিষ্ক কাজ করতে পারবে স্বাভাবিকভাবে। (৪) **শরীর গঠনে কাজ করে :** শরীরের জয়েন্টেও পানি থাকে। পানি ঠিকমতো পেলেই মাংসপেশী কাজ করে। অতএব ক্রীড়াবিদ হোন বা ব্যায়ামবীর হোন মাংসপেশী সুগঠিত করতে চাইলে প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে। (৫) **ত্বক সুস্থ রাখে :** কসমেটিক কোম্পানীগুলো ব্যবসা করে যাচ্ছে এই চিন্তাকে দূর করার কৌশল নিয়েই। বয়সের বলি রেখা কমানো, ত্বকের খসখসে ভাব দূর করা, রং ফর্সা করা, সারাদিন তরতাজা থাকা এসবের জন্য পানি কাজ করতে পারে সবচেয়ে বেশি। ত্বকের কোষ সুস্থ থাকলে এমনিতেই মানুষকে ফ্রেশ, সজীব দেখাবে। পানি ত্বকের পানিশূন্যতা কমায়। ত্বকের কোষকে পরিপূর্ণ রাখে। এতে মুখমণ্ডল থাকে তরুণ। (৬) **হজমে সাহায্য করে :** শাক-সবজি এবং আঁশযুক্ত খাবারের সঙ্গে প্রচুর পানি পান করতে হবে, তাহ'লে কোষ্ঠকাঠিন্য কমে যাবে। প্রচুর পানি খেলে হজমের পর খাবারের বর্জ্য অংশ সহজেই পানির সঙ্গে মিশে পায়খানা হিসাবে বেরিয়ে যায়। যখন শরীরে পানিশূন্যতা দেখা দেয়, শরীর অন্ত্রের মাধ্যমে পায়খানার সঙ্গে থাকা পানি শুষে নেয়, ফলে তৈরি হয় কোষ্ঠকাঠিন্য। (৭) **কিডনির পাথর প্রতিরোধ করে :** পানি পরিমাণ মতো পান করলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি অনেক কমে যায়। বিশ্বজুড়ে কোল্ডড্রিংকের ব্যাপক বিস্তারের কারণে কিডনিতে পাথর হওয়ার হার বেড়েছে, পানি কম খাওয়ার কারণে। কিডনির পাথর আসলে এক ধরনের নুন ও মিনারেল, যা ক্রিস্টাল আকারে জমে পাথরের মতো হয়। প্রচুর পানি পান করলে এই নুন ও মিনারেল জমে গিয়ে ক্রিস্টাল তৈরি করতে পারে না।

নিরামিষভোজিরাই বেশি সুস্থ থাকেন

নিরামিষভোজিরা আমিষ ভোজিদের চেয়ে অনেক বেশী সুস্থ থাকেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, অন্তত এক সপ্তাহের জন্যও যদি নিরামিষভোজি হওয়া যায়, তাহ'লে স্বাস্থ্যের যে লাভ হবে তা অন্য কোন খাবার কিংবা ওষুধে হবে না। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।-

১। ডি-টক্সিফাইড : একজন নিরামিষভোজি, যাদের খাদ্য তালিকায় প্রতিদিন যথেষ্ট ফাইবার সম্পন্ন সবজি যেমন লাউ, মিষ্টি কুমড়া, সবুজ শাক, বাঁধাকপি ইত্যাদি থাকে তাদের দেহের ক্ষতিকর দেহকোষগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এই সবজিগুলো দেহের সব বিষাক্ত উপাদান বাইরে বের করে দেয়। ডিম, মাছ এবং গোশতে এই ফাইবার কম থাকে বলে, এগুলো দেহ থেকে বিষাক্ত পদার্থ নিঃসরণে খুব বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে না।

২। হাড়কে শক্ত করা : গোশতভোজি ব্যক্তিদের নিয়মিত খাদ্য তালিকায় সবজি খুব সামান্য পরিমাণে থাকে। কিন্তু গোশতে আছে প্রচুর প্রোটিন এবং সবজিতে আছে প্রচুর ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়াম হাড়কে শক্ত করে। দেহে প্রোটিনের পরিমাণ বেড়ে গেলে এবং সেই তুলনায় ক্যালসিয়াম কমে গেলে, ক্যালসিয়াম তার কাজ করতে পারে না। যার ফলে দেহের অতিরিক্ত প্রোটিন শুষে নেয় ক্যালসিয়ামকে, যা হাড়ের ক্ষতি করে। তাই পুরোপুরি নিরামিষভোজি হওয়া না গেলেও, অন্তত দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় গোশত এবং সবজির একটা আদর্শ ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

৩। কার্বোহাইড্রেট ঘাটতি পূরণ : একজন গোশতভুক মানুষের খাদ্য তালিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে কার্বোহাইড্রেটের ঘাটতি থাকে, যা কেটসিস-এ আক্রান্ত করতে পারে। কেটসিস হ'ল দেহে অতিরিক্ত চর্বি বেড়ে যাওয়ার ফলে শক্তির ঘাটতি এবং ক্লান্তির সৃষ্টি হওয়া। কিন্তু খাদ্য তালিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ সবজির উপস্থিতি এই কার্বোহাইড্রেটের ঘাটতি পূরণ করতে পারে।

৪। পরিপাক প্রক্রিয়া সহজ করা : সবজিতে এমন সব উপাদান আছে, যা দেহের পরিপাক ক্রিয়াকে সহজ করে। কিন্তু গোশত এবং মাছে প্রচুর পরিমাণে চর্বি এবং তেল থাকায় তা আমাদের হজম প্রক্রিয়াকে জটিল করে তোলে।

৫। সুন্দর ত্বক : বিট, টমেটো, মিষ্টি কুমড়া এবং করলা নিয়মিত খেলে ত্বকের বিভিন্ন দাগ দূর হয়ে যায়। অন্যদিকে পেয়ারা, আপেল, নাশপাতি ত্বকে এনে দেয় আকর্ষণীয় উজ্জ্বলতা।

৬। ওযন নিয়ন্ত্রণ : ওযন বাড়তে না দেয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হ'ল গোশত না খাওয়া। আর ওযন কমানো এবং নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে সহজ উপায় হ'ল নিরামিষভোজি হওয়া। গমের রুটি, শিম, মটরসুঁটি, বাদাম এবং বিভিন্ন রঙিন ফল দেহের কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং স্থূলতা থেকে মুক্তি দেয়।

৭। স্বস্তিতে থাকে দাঁত : আমাদের পেষণ দাঁতের কাজ হ'ল খাবার চিবিয়ে তা হজমের জন্য সালিভায় পাঠানো। কিন্তু পেষণ দাঁত দিয়ে পেষণ বা চিবানোর কাজ না করে যখন টেনে গোশত ছেড়ার কাজে ব্যবহার করা হয়, তা দাঁতে এক ধরনের চাপের সৃষ্টি করে। অন্যদিকে সালিভায় গিয়েও হজম প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করে জটিলতা। কিন্তু সবজি সেদিক থেকে দাঁত এবং সালিভা দু'টোকেই স্বস্তি দেয়।

৮। ফিটোনিউট্রিয়েন্টস : ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, কিডনির রোগ, হৃদরোগ এবং হাড়ের ক্ষয়রোধ করা যায় পর্যাপ্ত পরিমাণের ফিটোনিউট্রিয়েন্টস গ্রহণের মাধ্যমে। এই ফিটোনিউট্রিয়েন্টস হ'ল এক ধরনের স্বাস্থ্যকরী উপাদান, যা শুধু সবুজ শাক সবজিতেই পাওয়া যায় এবং এটি দেহে গ্লুকোজ ও রঞ্জক পদার্থের জন্য উপকারী।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

জীবন তো গলা বরফ

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

জীবন সে তো বরফ গলা
টপটপিয়ে হচ্ছে ক্ষয়,
বিকিকিনির ব্যবসাতে তাই
সব সময়ে শঙ্কা রয়।
দিনটি ধরে বিক্রি করে
তবু যদি না হয় শেষ,
লাভের আশা? নেই ভরসা
আসল পুঁজি নিরুদ্দেশ!
তখন তো সে ব্যবসাদারের
বক্ষ ভাসে কান্নাতে,
ভরবে না তার শূন্য গৃহ
হীরা, চুনি, পান্নাতে।
বিকেল বেলায় দরাজ গলায়
বলছে হেঁকে কিনবে কে?
আমার দরদ বুঝে মদদ
করতে হেথায় আসবে কে?
সবটি বেলায় হেলায় ফেলায়
হেথায় সেথায় কাটল দিন,
দিনের শেষে সন্ধ্যা এসে
আকাশ যখন হয় রঙিন।
তখন কি আর বিকায় বরফ
যতই মারো জোরসে হাঁক?
জীবন খেলার অস্তবেলায়
প্রভুকে তুমি দিচ্ছ ডাক!

***

মা

এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

মা আমার মা
আমার চেনা ঠিকানা,
কারো সাথে মা জননীর
হয় না তুলনা।
তোমার কোলে জন্ম মাগো
তুমি নয়নমণি,
তুমি মাগো এই জগতে
শ্রেষ্ঠ সোনার খনি।
তোমার কোলে মাগো আমার
শীতল পাটির বিছানা,
তোমার পায়ের নীচে মাগো
জান্নাতের ঠিকানা।
তোমার বুকের দুগ্ধ মাগো
করছি কত পান,
তুমি মাগো আল্লাহ তা'আলার
শ্রেষ্ঠ অনুদান।
ঐ বিধাতার কোমল মাটি
দিয়ে সৃষ্টি তুমি,
তোমার বুকে মাগো আমার
প্রিয় জন্মভূমি।

আজকের শিশু

আব্দুল মুনায়েম
সোনাডাঙ্গা, বাগমারা, রাজশাহী।

আজকের শিশু-
উৎসুক চোখে টোকা মারে আকাশে
নেই কোন সাড়া; শিশু বলে-
অহংকার কর ভাই! আমার আকাশ তুমি,
হ'তেও তো পার কারো যমীন।
ডুব দেয় সাগরে,
কুঁড়ে আনে মণি-মুক্তা-জহরত;
দেখে ইতিহাস, আজগুবি কথা সব
মিল নেই কোনখানে।
আমি বলি, চেয়ে দেখ বাস্তবে
অপসংস্কৃতি আর বিদেশী সজ্জায়
গালভরা গল্পে ছুটে চলে লুটেরা
চিনে রাখ আজকের শিশুরা।

শান্তি কোথায়?

যাকওয়ান হুসাইন
শালিখা, সোনাতলা, বগুড়া।

অশান্তি আর অরাজকতায়
ভরে গেছে দেশটা,
জনদুর্ভোগ কমাতে
কেউ করে না চেষ্টা।
মিছিল-মিটিং-হরতাল
চলছে প্রতিদিন,
খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি
নিত্যদিনের রুটিন।
শান্তি নামের সোনার হরিণ
নাইকো আর দেশে,
অশান্তি আর দুর্নীতিতে
দেশটা ছেয়ে গেছে।
মারছে মানুষ, মরছে মানুষ
অশান্তিরই কালো থাবায়,
নেতা-নেত্রীর কাছে প্রশ্ন আমার-
শান্তি মোরা পাব কোথায়?

মাটির ঘর

ডাঃ মুহাম্মাদ গোলাপ উদ্দীন মিয়া
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

থাকব পড়ে মাটির ঘরে, শয্যাবিহীন অন্ধকার
কীট-পতঙ্গ খাবে দেহ
করবে না কেউ প্রতিকার।
পাপ-পুণ্যের হিসাব হবে, নিখুঁত নিক্তি-বাটখারা
জ্বলতে হবে জাহান্নামে
পড়বে হাতে হাতকড়া।
বাঁচার উপায় আছে জানি
যতক্ষণ এই দেহে আছে দম,
আয়রে ভাই, বন্ধু সবাই
তওবা করি হই শোধন।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১। আব্বাসীয় খলীফা আল-আমীন, বুখারী।
২। শিক্ষা-সংস্কৃতির লীলাভূমি।
৩। ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে।
৪। সত্তর হাযার।
৫। এক হাযার আশি জন।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১। শিল/পাথর ২। চশমা ৩। বট
৪। কবুতর ৫। কলা ও মোচা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান)

১। যদি চাঁদে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে তাহ'লে তা পৃথিবীতে কতক্ষণে শুনা যাবে?
২। চাঁদে কোন শব্দ করলে তা শুনা যাবে না কেন?
৩। আলোর চেয়ে শব্দের গতিবেগ কত?
৪। পুকুরের পানিতে বৃষ্টির ফোঁটা পড়লে বাইরে থেকে যে শব্দ খুব আস্তে শুনা যায়, পানিতে ডুব দিয়ে শুনলে ঐ শব্দ বেশ জোরে শুনা যায় কেন?
৫। শব্দের গতি ঘণ্টায় কত মাইল?

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ইসলামী)

১। 'আবুল আম্বিয়া' বা নবীগণের পিতা কাকে বলা হয়?
২। 'উম্মুল আম্বিয়া' বা নবীগণের মাতা কাকে বলা হয়?
৩। বনী ইসরাঈলরা কোন নবীর বংশধর ছিল?
৪। ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধরে কতজন নবী পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন?
৫। ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে কোন নবী জন্মগ্রহণ করেন?

সংগ্রহে : বযলুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সম্মেলন ২০১১

বাংলাদেশের একজন সুনাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ভিত্তিভূমি এই প্রতিযোগিতার মধ্যে তৈরী হচ্ছে

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৪ অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহীতে **'৯ম কেন্দ্রীয় সোনামণি সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী ২০১১'** অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে রাজশাহী-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ফজলে হোসেন বাদশা উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, 'আমি একজন রাজনীতিবিদ। আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশে কোন রাজনীতি চলবে না, যদি বাংলাদেশের মাটিতে ইসলামের স্বার্থকে বিবেচনা না করা হয়'। তিনি বলেন, এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে ড. গালিব জঙ্গি কিনা প্রশ্ন করলে উত্তরে আমি বলেছিলাম, 'গালিব ছাহেবকে আমি শিক্ষক হিসাবে জানি, জঙ্গীবাদী হিসাবে নয়'। তিনি বলেন, 'জঙ্গীবাদ ইসলামের বন্ধু নয়, ইসলামের শত্রু। জঙ্গীবাদের মদদদাতা আমেরিকা ও ইহুদীবাদীরা। মুসলমানরা কখনও জঙ্গীবাদকে সমর্থন করে না। কারণ ইসলাম হচ্ছে শান্তির ধর্ম।' তিনি আরো বলেন, 'শুধু বাংলাদেশে নয় গোটা পৃথিবীতে এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম ছড়িয়ে পড়বে।'

মাননীয় সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, 'মানুষকে বিপথে নেয়ার জন্য শয়তান প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। শয়তান মানুষকে সবসময় ধোঁকা দিচ্ছে অন্যায় করার জন্য। আর এর বিরুদ্ধে আল্লাহ পাক চান যে, সবসময় মানুষকে ভাল পথে ডাকা। আমাদের সোনামণি, যুবসংঘ, মহিলা সংস্থা ও 'আন্দোলন' সর্বদা মানুষকে ভালোর পথে ডাকারই সংগঠন'। তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কেন্দ্রীয় প্রতিযোগী সোনামণিদের মারকাযে স্বাগত জানান ও তাদের উন্নত ভবিষ্যতের জন্য দো'আ করেন এবং নিজেদেরকে আদর্শ নেতা ও প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হক, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ১৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আলহাজ্জ শাহাদত হোসেন (শাহু), বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক এম.এ.ওহাব মণ্ডল, 'সোনামণি'-এর পৃষ্ঠপোষক ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, 'সোনামণি'-এর ১ম পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, বর্তমান পরিচালক ইমামুদ্দীন প্রমুখ। উল্লেখ্য, দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার কেন্দ্রীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা ১৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় দেশের প্রায় ১৫টি যেলা অংশগ্রহণ করে। পরিশেষে উক্ত অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে ক্রেস্ট, সনদপত্র ও আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিজয়ীদের নামের তালিকা নিম্নরূপ :

অর্থসহ ১০টি হাদীছ মুখস্থ : বালক- (১) ইউনুসুর রহমান (কুমিল্লা) (২) আসাদুল্লাহ আল-গালিব (কুষ্টিয়া) (৩) আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ); **বালিকা-** (১) আসমা বিনতে শারাফাত (কুমিল্লা) (২) সুলতানা (রাজশাহী) (৩) তানজিলা আখতার (কুমিল্লা); **আক্বীদা বিষয়ক ২৭ টি প্রশ্নের উত্তর : বালক-** (১) আসাদুল্লাহ আল-গালিব (কুষ্টিয়া) (২) মুহাম্মাদ রামাযান শেখ (বাগেরহাট) (৩) জামীলুর রহমান (কুড়িগ্রাম); **বালিকা-** (১) রুবীয়া পারভীন (সিরাজগঞ্জ) (২) সুলতানা (রাজশাহী) (৩) আমেনা (রংপুর); **সাধারণ জ্ঞান : বালক-** (১) মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিন (সিরাজগঞ্জ) (২) আব্দুল কাফী (বগুড়া) (৩) আসাদুল্লাহ আল-গালিব (কুষ্টিয়া); **বালিকা-** (১) ইসরাত নৌরিন (সিরাজগঞ্জ) (২) রুবীয়া পারভীন (ঐ) (৩) মার্যিয়া খাতুন (ঐ); **জাগরণী : বালক-** (১) তানভীর আহমাদ (গাইবান্ধা) (২) আল-সাবা (ঐ) (৩) ইলিয়াস (বগুড়া); **বালিকা-** (১) তামান্না তাসনীম (রাজশাহী) (২) সুমাইয়া শিমু (দিনাজপুর) (৩) আসমা বিনতে শারাফাত (কুমিল্লা); **ছবি অংকন : বালক-** (১) আব্দুর রহীম (বগুড়া) (২) কামরুল (ঐ) (৩) আব্দুল্লাহ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ); **বালিকা-** (১) তাসনীম (খুলনা) (২) তানযীলা আখতার (কুমিল্লা) (৩) আসমা বিনতে শারাফাত (ঐ)।

স্বদেশ-বিদেশ

রাবির দুই পদার্থ বিজ্ঞানীর নতুন থিওরি

আলোর চেয়ে নিউট্রিনোর গতি অনেক বেশি

আজ থেকে ১০৬ বছর আগে ১৯০৫ সালে 'রিলেটিভিটি' বা 'আপেক্ষিকতত্ত্ব' মতবাদে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন দেখিয়েছিলেন, আলোর গতি সবচেয়ে বেশি। তার রিলেটিভিটি মতবাদ অনুযায়ী কোন বস্তুর গতি আলোর চেয়ে বেশি হওয়া তো দূরের কথা, এমনকি সমানও হ'তে পারে না। সেই থেকে এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন বিজ্ঞানীই তার ঐ মতবাদের বাইরে নতুন কোন থিওরি দিতে পারেনি। কিন্তু দীর্ঘ ১০৬ বছর পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন পদার্থবিজ্ঞানী ১৫/২০ বছর যাবৎ গবেষণা চালিয়ে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করে নতুন থিওরি দিয়েছেন। তাদের গবেষণায় সম্প্রসারিত আপেক্ষিকতত্ত্ব মতবাদের সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, বস্তুর বেগ আলোর চেয়ে বেশি হ'তে পারে। সেই বস্তুকণিকা 'নিউট্রিনো' আলোর চেয়ে বেশি বেগে স্থানান্তরিত হয়। গত ৭ অক্টোবর দুপুরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরী ভবনের শিক্ষক লাউঞ্জে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেক্ট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ ওছমান গণী তালুকদার ও প্রফেসর ড. মুশফিক আহমাদ এ দাবী করেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সম্প্রতি একদল ইউরোপীয় বিজ্ঞানী জেনিভার কাছে ভূগর্ভস্থ সার্নের গবেষণাগার থেকে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন বিশেষ জাতের কণা 'নিউট্রিনো'। মাটি ফুঁড়ে সেই সমস্ত কণা গিয়ে পৌঁছায় ৭৩০ কি.মি. দূরে ইতলীয় গ্র্যান স্যাসো পাহাড়ে অবস্থিত অন্য একটি গবেষণাগারে। ঐ দূরত্ব পাড়ি দিতে আলোর যে সময় লাগত নিউট্রিনোগুলোর সময় লেগেছে তার চেয়ে ১ সেকেন্ডের একশ' কোটি ভাগের ৬০ ভাগ কম। আলোর গতি যেখানে সেকেন্ডে ২৯ কোটি ৯৭ লাখ ৯২ হাযার ৪৫৮ মিটার, সেখানে নিউট্রিনোর গতি সেকেন্ডে ২৯ কোটি ৯৭ লাখ ৯৮ হাযার ৪৫৪ মিটার। যার অর্থ হ'ল নিউট্রিনো ছুটতে পারে আলোর চেয়ে বেশি গতিতে।

এর আগে ড. ওছমান গণী ও ড. মুশফিক আহমাদ সংবাদ সম্মেলন করে, বই প্রকাশ করে এবং প্রবন্ধ লেখাসহ নানাভাবে ঘোষণা দিয়ে আসছিলেন যে, বস্তুর বেগ আলোর বেগের চেয়ে বেশি হ'তে পারে। ২০০১ সালে ড. গণী An Alternative Approach to the Relativity নামক একটি বই প্রকাশ করেন। এ বইটি প্রকাশ করার আগে ২০০১ সালের ২০ মে সংবাদ সম্মেলনে নিউট্রিনো নামক বস্তুকণিকা আলোর গতির চেয়ে বেশি বলে তিনি ঘোষণা দেন। দীর্ঘ ২০ বছরে তারা গবেষণা করে আইনস্টাইনের অসম্পূর্ণ আপেক্ষিকতত্ত্ব মতবাদকে আরো সম্প্রসারিত ও সম্পূর্ণ করাসহ এ সংক্রান্ত নতুন তিনটি সমীকরণ ও কিছু মৌলিক ধ্রুব সংখ্যা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।

গ্রামীণফোনের বিরুদ্ধে তিন হাযার ৩৪ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগ

দেশের শীর্ষস্থানীয় মোবাইল অপারেটর গ্রামীণফোনের বিরুদ্ধে সূদ-আসল মিলিয়ে প্রায় ৩ হাযার ৩৪ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগ এনেছে 'বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন' (বিটিআরসি)। গত ৩ অক্টোবর গ্রামীণফোন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে তিন সপ্তাহের মধ্যে উক্ত টাকা জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে বিটিআরসি। এদিকে গ্রামীণফোন অডিট রিপোর্ট নাকচ করে দিয়ে ৪ অক্টোবর বিটিআরসিকে পাল্টা চিঠি দিয়েছে। তারা বলেছে, বিটিআরসির যে অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে টাকা দাবী করা হয়েছে তা আন্তর্জাতিক এমনকি জাতীয় মানদণ্ডের অডিটও হয়নি। গত ১৭ এপ্রিল থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গ্রামীণফোনে পরিচালিত অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে এই রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে বিটিআরসির চেয়ারম্যান জানিয়েছেন। রাজস্ব আদায় নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে বিটিআরসি ও গ্রামীণফোনের মধ্যে আয়োজিত ১০ অক্টোবরের বৈঠক কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়েছে। এদিকে গত ১৬ অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনে টেলিনরের এশীয় অঞ্চলের প্রধান এবং গ্রামীণফোনের (জিপি) পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান সিগভে ব্রেক্কে জানিয়েছেন, বিটিআরসির দাবী করা তিন হাযার ৩৪ কোটি টাকা দেবে না জিপি। প্রয়োজনে তারা আইনের আশ্রয় নেবে বলে তিনি জানান। সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, দ্বিতীয় প্রজন্মের (টু-জি) লাইসেন্স নবায়নে তরঙ্গ বা স্পেক্ট্রাম ফি হিসাবে গ্রামীণফোন, বাংলালিংক, রবি ও সিটিসেলকে অতিরিক্ত মোট ৪২৭ কোটি ৯৮ লাখ টাকা পনেরো দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য গত ১৭ অক্টোবরে চিঠি পাঠিয়েছে বিটিআরসি। এর মধ্যে গ্রামীণফোনকে এখন অতিরিক্ত ৩৮২ কোটি ৮৩ লাখ সহ মোট জমা দিতে হবে তিন হাযার ৬২৪ কোটি তিন লাখ টাকা।

দেড় কোটি টাকা নিয়ে বগুড়ায় এমএলএম কোম্পানী ড্রিমল্যান্ড লাইট চম্পট

'মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং' (এমএলএম) ব্যবসার নামে পাঁচ শতাধিক গ্রাহকের দেড় কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে বগুড়া থেকে উধাও হয়ে গেছে 'ড্রিমল্যান্ড লাইট লিমিটেড' নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। কোম্পানীটির বগুড়ার ফিল্ড সুপারভাইজার ফাতেমাতুয্যাহরা জুলির আমন্ত্রণে এক বছরে বড়লোক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে বহু নারী লাখ লাখ টাকা জমা দেয় কোম্পানীতে। কেউ ব্যবহৃত গহনা বিক্রি করে, কেউ জমি বন্ধক রেখে, কেউ ব্যাংকের ডিপিএস ভেঙ্গে বহু কষ্ট করে প্রত্যেকে ২১ হাযার করে টাকা জমা দিয়ে কোম্পানীর সদস্য হন। ভুক্তভোগী একজন জানান, ২১ হাযার টাকা জমা রাখলে এক বছর পর ঐ সদস্যকে ৫৬ হাযার টাকা দেয়ার মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। বিশ্বাস স্থাপনের লক্ষ্যে শুরুতে বেশ কয়েকজন সদস্যকে প্রতি সপ্তাহে কমিশনও দেয়া হয়। টাকা জমা নেয়া হয় অথচ কোন প্রমাণপত্র দেয়া হয় না। এক মাস পর সদস্যদের কমিশনের টাকা বন্ধ করে দেয়া হয়। একপর্যায়ে গত ১২ অক্টোবর বিকেলে অফিসের আসবাবপত্র সরানোর খবর পেয়ে সদস্যরা ছুটে এসে অফিস ঘেরাও করে। কাউকে না পেয়ে অফিসের ফিল্ড সুপারভাইজার জুলিকে আটক করে সদর থানায় সোপর্দ করে তারা। উল্লেখ্য, কোম্পানীটির প্রধান অফিস রাজধানীর ফকিরাপুলে বলে জানা যায়।

মিসরীয় নাগরিককে হত্যার দায়ে সঊদীতে ৮ বাংলাদেশীর শিরশ্ছেদ

সঊদী আরবে ৮ বাংলাদেশী নাগরিককে প্রকাশ্যে শিরশ্ছেদ করা হয়েছে। হাসান আস-সা'ঈদ নামক এক মিসরীয় নাগরিককে হত্যার অভিযোগে তাদের প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সঊদী আরবের সর্বোচ্চ আদালতের আদেশে গত ৭ অক্টোবর রাজধানী রিয়াদে আছরের ছালাতের পর তাদের দণ্ড কার্যকর করা হয়। তাদের লাশ সঊদী আরবেই দাফন করা হয়েছে। যাদের শিরশ্ছেদ করা হয়েছে তারা হ'লেন, সুমন মিয়া (কিশোরগঞ্জ), মুহাম্মাদ সুমন

(টাঙ্গাইল), মাস'উদ (ঐ), মামূন (ঐ), শফীকুল ইসলাম (ঐ), ফারূক জামাল (কুমিল্লা), আবুল হোসেন (ফরিদপুর) ও মতীউর রহমান (ঐ)।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া ৮ বাংলাদেশীসহ মোট ১১ জন বাংলাদেশী ২০০৭ সালের ২২ এপ্রিল রিয়াদে এক গুদাম থেকে বৈদ্যুতিক তার চুরির সময় সে গুদামের মিসরীয় গার্ড হাসান আস-সা'ঈদকে তারা হত্যা করে। অভিযুক্তরা আদালতে তাদের এ অপরাধের কথা স্বীকারও করেন। আসামীদের স্বীকারোক্তি ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী বিচার করে তাদের বিরুদ্ধে ডাকাতি, নরহত্যা এবং যমীনে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিচারিক আদালত উল্লেখিত ৮ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং অন্য তিনজনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও বেত্রাঘাতের দণ্ড প্রদান করে।

আদালত সমূহ জুয়ার আড্ডা

-ড. আকবর আলী

বাংলাদেশের আইনজ্ঞদের ইতিহাস পাঠ করতে হবে। ব্রিটিশরা যে আইন প্রণয়ন করে গেছে বর্তমান আইন ব্যবস্থার সঙ্গে তার কোন মিল নেই। এ ব্যবস্থায় দু'পক্ষের জেতার কোন সুযোগ নেই। ব্রিটিশদের এই আইনের মাধ্যমে জাল দলীল করা এবং একজনকে জেলে পাঠানো সম্ভব হ'ত। সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে আমাদের বিচার ব্যবস্থা জুয়ার আড্ডায় পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় নৈতিকতার ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করে দেশকে রক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলী খান। তিনি গত ১৬ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

১০৬ বছরের এক বৃদ্ধের করুণ কাহিনী

মাত্র দুই বিঘা জমি স্ত্রী-সন্তানদের নামে লিখে না দেয়ায় টাঙ্গাইলের মধুপুরের অরণখোলা ইউনিয়নের আকালিয়া বাড়ী গ্রামের ১০৬ বছরের বৃদ্ধ মুহাম্মাদ আলী পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হন। বেছে নেন ভিক্ষাবৃত্তির জীবন। এরপর প্রাণে বেঁচে থাকতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ১৫০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে খাদ্যমন্ত্রী ড. আব্দুর রায্যাকের কাছে তার বাসায় গিয়ে বিচার চেয়ে লিখিত অভিযোগ করেন। মন্ত্রী তার অভিযোগ আমলে নিতে উপযেলা চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে লিখিত চিঠিসহ ধনবাড়ীর একটি মাইক্রোবাসে অন্যদের সঙ্গে ঐ বৃদ্ধকে মধুপুর পাঠিয়ে দেন।

বিনা মাশুলে ট্রানজিট শুরু

স্থায়ী কোন অবকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও আশুগঞ্জ নৌবন্দর দিয়ে ভারতকে বিনা মাশুলে ট্রানজিট দেয়া শুরু হয়েছে। এই নৌবন্দরে বালুর বস্তা দিয়ে অস্থায়ী ঘাট বানানো হয়েছে, যেখানে ঝুঁকি নিয়ে ভারী মালপত্র নামানো হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) অফিস চলছে পেট্রোলপাম্পের দু'টি কক্ষ ভাড়া নিয়ে। আশুগঞ্জ থেকে আখাউড়া স্থলবন্দর পর্যন্ত সড়কপথ কোনভাবেই ভারী যান চলাচলের উপযোগী না হ'লেও বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান নৌ-প্রটোকলের আওতায় ট্রানজিট পণ্য ত্রিপুরার আগরতলায় যাচ্ছে। এতে মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে আশুগঞ্জ নৌবন্দর বিশেষ করে ৫৫ কিলোমিটার সড়কপথের। আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর ও আখাউড়া- এই তিন উপযেলার বিস্তীর্ণ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। নৌ-প্রটোকলের আওতায় এসব ট্রানজিট পণ্যে ভারতকে কোন মাশুল দিতে হচ্ছে না।

বিদেশ

পুঁজিবাদ বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল বিশ্ব

পুঁজিবাদের লোভ-লালসা, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ও সরকারের ব্যয় সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে গোটা বিশ্ব বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক বৈষম্য, বেকারত্ব ও বঞ্চনার প্রতিবাদে 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট' বা 'ওয়াল স্ট্রিট দখল কর' নামে নিউইয়র্কে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, তার উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে আমেরিকা-ইউরোপ হয়ে আফ্রিকা, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৫ অক্টোবর ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, লাতিন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার ৮২টি দেশের ৯৫১টি শহরে বিক্ষোভ হয়েছে। মূলত অর্থনৈতিক অসমতা, বেকারত্ব ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই বিশ্বের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভে নামে মানুষ। ঐদিন সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ হয়েছে ইতালির রাজধানী রোমে। সেখানে দুই লাখেরও বেশি মানুষ বিক্ষোভে যোগ দেয়। এদিকে আমেরিকার নিউইয়র্কে প্রতিদিনই পুঁজিবাদের প্রতীক 'ওয়াল স্ট্রিটে' বিক্ষোভ হচ্ছে। দেশটির মোট সম্পদের শতকরা নিরানব্বই ভাগ মাত্র এক ভাগ নাগরিকের হাতে কুক্ষিগত রয়েছে। অন্যদিকে মার্কিন সরকার সাধারণ নাগরিকদের ওপর নতুন নতুন করের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে এবং দেশটির সাধারণ জনগণের জন্য সাহায্যের কোন প্যাকেজ ঘোষণা না করে কেবল ধনকুবেরদের নিয়ন্ত্রিত কথিত 'দেউলিয়া হয়ে পড়া' ব্যাংক ও কোম্পানীগুলোকে অর্থ সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। অথচ মালিক ও পুঁজিপতিদের দুর্নীতির কারণেই এসব প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে পড়েছে এবং বেড়েছে বেকারত্ব। সরকারী সাহায্যের সুবিধাভোগী ব্যাংক ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর ক্ষোভের কারণেই চলমান গণঅসন্তোষ শুরু হয়েছে ওয়াল স্ট্রিটসহ গোটা আমেরিকায়। উল্লেখ্য, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে ৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে।

দিল্লীতে দিনে ৩৮ জন ধর্ষণের শিকার হন

ভোর ৬-টা থেকে বেলা ১২-টার মধ্যেই ভারতের রাজধানী দিল্লীতে ৭টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। বেলা ১২-টা থেকে সন্ধ্যা ৬-টার মধ্যে ১৭টি এবং সন্ধ্যা ৬-টা থেকে রাত ১২-টা পর্যন্ত ১৪ জন ধর্ষণের শিকার হন। সেখানে একদিনে মোট ৩৮ জন ধর্ষণের শিকার হন। 'সেন্টার ফর সোশ্যাল রিসার্চে'র একটি সমীক্ষায় এ তথ্য উঠে এসেছে। ২০০৯ সালের জানুয়ারী থেকে ২০১১'র জুলাই পর্যন্ত পুলিশের কাছে দায়ের হওয়া ৫৮টি এফআইআর বিশ্লেষণ করে এই চিত্র মিলেছে।

ব্রিটেনের মাত্র ৫ শতাংশ মানুষ সুখী; সামাজিক অবক্ষয়ে ৫৯ শতাংশের উদ্বেগ প্রকাশ

অপরাধপ্রবণতা ও সহিংসতার হার বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার উচ্চ ব্যয়ের কারণে ব্রিটিশরা দিন দিন হয়ে উঠছে অসুখী। শুধু তাই নয়, ব্রিটেনের চেয়ে কম আয়তনের দেশ বিশেষ করে পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, স্পেনের মানুষ যেখানে সুখী ও সচ্ছলভাবে জীবন যাপন করছে, সেখানে মাত্র পাঁচ শতাংশ ব্রিটিশ বলছে তারা সুখী। ইউরোপের ১০টি দেশের মধ্যে ঐ গবেষণা চালায় 'ইউসুইচ ডটকম' নামের একটি ওয়েবসাইট কর্তৃপক্ষ। গবেষণায় দেখা যায়, লণ্ডনের ৫৯ শতাংশ মানুষই দেশটির সামাজিক অবক্ষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সাম্প্রতিক দাঙ্গার পর তাদের এই উদ্বেগ আরো বেড়েছে। ৪৯ শতাংশ মানুষ বলেছে, সবকিছুর দাম বেড়ে যাওয়ায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা তাদের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ৪৭ শতাংশ অপরাধ ও সহিংসতার ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় রীতিমত আতংকিত।

ইরাক ও আফগান যুদ্ধকে অপচয় মনে করেন মার্কিন সৈনিকেরা

ইরাক ও আফগান যুদ্ধফেরত প্রতি তিনজনের একজন মার্কিন সেনাসদস্য মনে করেন, এই যুদ্ধ অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা

বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত আন্তর্জাতিক বিষয়ের দিকে নজর কম দিয়ে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া। 'পিউ রিসার্চ সেন্টার' পরিচালিত ঐ জনমত জরিপ গত ৫ অক্টোবর প্রকাশ করা হয়। গত জুলাইয়ের শেষ দিকে এবং সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে জরিপটি করা হয়। প্রথমবার এক হাযার ৮৫৩ এবং দ্বিতীয় দফায় দুই হাযার তিনজনের ওপর ঐ জরিপ করা হয়। উল্লেখ্য, টাইম অনলাইনের প্রতিবেদন মতে, ইরাকে এ পর্যন্ত সাড়ে চার হাযার এবং আফগানিস্তানে এক হাযার ৭শ' মার্কিন সেনাসদস্যের প্রাণহানি হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করছে ডাচ সরকার

সব ধরনের মাদক নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নেদারল্যান্ড সরকার। গত ৭ অক্টোবর ডাচ সরকার এ ঘোষণা দিয়েছে। সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হয়, প্রথমেই কোকেন বা এক্সটেসি জাতীয় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নেশার দ্রব্য চিহ্নিত করা হবে। এরপর ধাপে ধাপে সব ধরনের মাদকদ্রব্য পৃথক করে নিষিদ্ধ করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চীনের বাণিজ্যযুদ্ধের হুমকি

আন্তর্জাতিক বাজারে চীনা মুদ্রা 'ইওয়ানে'র বিনিময় হার বাড়ানো সংক্রান্ত বিল কংগ্রেসে পাস করলে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু করবে বলে হুমকি দিয়েছে চীন। গত ৪ অক্টোবর এক বিবৃতিতে চীন বেশ ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছে, চীনা মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধির জন্য বেইজিংকে চাপ দেয়ার উদ্দেশ্যে মার্কিন কংগ্রেসে প্রস্তাবিত বিল পাস হ'লে তা বিশ্বের এ দুই শীর্ষ ধনী দেশের অর্থনীতিকে বাণিজ্যযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবে। গত ৩ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট বিলটি নিয়ে এক সপ্তাহ বিতর্কের জন্য অনুমোদন দিয়েছে। তার আগে গত বছর মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি কক্ষ এরকম একটি মুদ্রা বিল পাস করেছিল। ঐ সময়ও চীন এ ব্যাপারে একই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। এ বিল পাস হ'লে মার্কিন সরকার যেসব দেশ মুদ্রার অবমূল্যায়নের মাধ্যমে রফতানী উৎসাহিত করতে চায়, সেসব দেশের পণ্যে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করতে পারবে।

২০১১ সালের নোবেল বিজয়ীরা

চিকিৎসা : ২০১১ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রুস বিউটলার, লুক্সেমবার্গের জুলেস হফম্যান ও কানাডার র‍্যালফ স্টেইনম্যানকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় অসামান্য অবদানের জন্য তাদের এ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। এদের মধ্যে স্টেইনম্যান ৩০ সেপ্টেম্বর মারা গেছেন।

পদার্থ : এবার পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেয়েছেন তিন মার্কিন বিজ্ঞানী সল পার্লমুটার, ব্রায়ান শ্মিট ও অ্যাডাম রিস। মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল বিষয়ে গবেষণার জন্য তাদেরকে এ পুরস্কার দেয়া হয়।

রসায়ন : রসায়নে চলতি বছরের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ইসরাঈলী গবেষক দানিয়েল শেকতমান (৭০)। পরমাণু নিয়ে গবেষণার জন্য তাকে এ পুরস্কার দেয়া হয়।

সাহিত্য : এবার সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন সুইডিস কবি টমাস ট্রান্সমার। অল্প কথায় চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়ে নতুন এক বাস্তবতার সঙ্গে পরিচয়ে করিয়ে দেয়ার জন্য তাকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

শান্তি : শান্তিতে এ বছর যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিন নারী। তারা হ'লেন, লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট এলেন জনসন-শারলিফ এবং তার স্বদেশী লোমা বোয়ি ও ইয়েমেনের তাওয়াক্কুল কারমান। নারীর নিরাপত্তা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণের অধিকার আদায়ে অহিংস আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য তারা এ পুরস্কার পান।

অর্থনীতি : সূদের হার বৃদ্ধি বা কর কমানোর মতো পদক্ষেপগুলো জিডিপি ও মূল্যস্ফীতির মতো সামষ্টিক অর্থনীতির বিষয়গুলোকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা নিয়ে গবেষণার জন্য চলতি বছরের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ থমাস সার্জেন্ট ও ক্রিস্টোফার সিমস।

আফগান যুদ্ধের প্রভাবে কানাডার প্রতিরক্ষা বিভাগে কাটছাঁট

কানাডা সরকার প্রতিরক্ষা খাতে নানাভাবে কাটছাঁট করছে। আফগান যুদ্ধে খরচের প্রভাবেই এই কাটছাঁটের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বড় ধরনের ছাটাইয়ের অংশ হিসাবে এরই মধ্যে ২৫০টি সিভিলিয়ান পজিশন কমানো হচ্ছে মিলিটারী থেকে। আগামী ৩ বছরে ২ হাযার ১শ' সিভিলিয়ান পজিশন কমানোর ঘোষণাও দিয়েছে প্রতিরক্ষা বিভাগ।

অপরাধ বেড়ে যাওয়ার কারণে ব্রিটেনের ধনীরা দেশ ছাড়ার চিন্তা করছেন

ব্রিটেনের ধনীরা দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও বসতি গড়ার চিন্তা করছেন। বিশেষ করে গত আগষ্টে লন্ডনসহ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শহরে দাঙ্গার পর এই প্রবণতা বেড়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত 'লয়েড টিএসবি ইন্টারন্যাশনাল ওয়েলথ' জরিপে এই তথ্য উঠে এসেছে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৬১ শতাংশ ব্রিটেন ছেড়ে যাওয়ার বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় রেখেছেন। দেশে অপরাধ ও সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড বেড়ে যাওয়াই এর প্রধান কারণ বলে তারা উল্লেখ করেছেন।

যুক্তরাজ্যে বেকারত্বের হার ১৭ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ

যুক্তরাজ্যে ১৭ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেকারত্ব দেখা দিয়েছে। দেশটির জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের জুন থেকে আগষ্ট পর্যন্ত তিন মাসে বেকারের সংখ্যা বেড়ে ২৫ লাখ ৭০ হাযারে দাঁড়িয়েছে। এই তিন মাসে নতুন করে এক লাখ ১৪ হাযার লোক বেকার হয়েছে। ১৯৯৪ সালের পর দেশটিতে এত বেশি বেকারত্ব দেখা যায়নি। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবেই যুক্তরাজ্যের বর্তমান সংকট দেখা দিয়েছে।

ভারতের ৭৭ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে

ভারতের সরকারী হিসাব মতে, দেশটির ১২১ কোটি মানুষের মধ্যে শতকরা ৩৭ ভাগ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। কিন্তু বেসরকারী হিসাব মতে সেখানে দারিদ্র্যসীমার নীচে ৭৭ শতাংশ মানুষের বসবাস।

মানুষ কতটা পাষাণ হ'তে পারে!

গত ১৩ অক্টোবর চীনের গুয়াংদং প্রদেশের শিল্পনগর ফশানের একটি পাইকারী বাজারে পারিবারিক দোকানের অদূরে এক রাস্তায় দুই বছরের মেয়ে শিশু ইউ ইউকে প্রথমে একটি সাদা ছোট যান এসে ধাক্কা দেয়। এরপর একটি ট্রাক এসে আঘাত করে। তখন সে মরণ- যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। এমতাবস্থায় তার পাশ দিয়ে কমপক্ষে ১৮ জন পথচারী যাতায়াত করে। কিন্তু কেউ তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেনি। ঐ ছোট্ট শিশুটির গগণবিদারী আর্তনাদ কোন পাষাণের হৃদয়জগতে সামান্যতম দয়ার উদ্রেক করেনি। অবশেষে চেন জিয়ানমেই (৫৮) নামের এক ছিন্নমূল, ময়লা-আবর্জনা ঘাঁটাই যার কাজ, তিনি শিশুটিকে দেখামাত্র হাতের ব্যাগ ফেলে ছুটে যান তার কাছে। তিনি তাকে উদ্ধার করে তার মাকে খুঁজে বের করেন। মা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। শিশুটি শহরের একটি সামরিক হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন আছে।

মুসলিম জাহান

আন্তর্জাতিক বাহিনীর হাতে গাদ্দাফী নিহত

লিবিয়ার অবিসংবাদিত নেতা কর্ণেল মু'আম্মার আল-গাদ্দাফী সাম্রাজ্যবাদী ইহুদী-খৃষ্টানচক্রের সামরিক জোট 'ন্যাটো'র বিমান হামলায় গত ২০ অক্টোবর নিহত হন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন*। নিজ জন্মশহর সির্ত থেকে ২০ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৮-টার দিকে পালানোর চেষ্টা করেন গাদ্দাফী। এ সময় তার গাড়িবহরে বিমান হামলা চালায় ন্যাটো। হামলায় গাদ্দাফির গাড়ি বহরের ১৫টি ট্রাকই ধ্বংস হয় এবং আরোহী ৫০ জন নিহত হন। নিহতদের মধ্যে ছিলেন গাদ্দাফী পুত্র মু'তাছিম ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী আবূবকর ইউনুস। তবে কয়েকজন সঙ্গীসহ গাদ্দাফী বেঁচে যান। গাছের আড়াল দিয়ে তিনি মূল রাস্তার দিকে দৌড়ে যান এবং পয়ঃনিষ্কাশন পাইপে লুকিয়ে পড়েন। তখন সেখান থেকে তাকে বাইরে নিয়ে আসা হয়। তখন তিনি আহত ছিলেন। তার মাথা ও নাক দিয়ে রক্ত ঝরছিল। এরপর তাকে একটি গাড়ির বনেটের ওপর টেনেহেঁচড়ে তোলা হয়। আবার একইভাবে নামানো হয়। এ সময় একজন তার মাথা বরাবর বন্দুক তাক করে গুলী করলে তিনি নিহত হন। তাঁর লাশ মিসরাতা শহরের এক বাজারে বড় একটি গোশত রাখার হিমঘরে রাখা হয়েছে। এভাবে ১৯৮৬ সাল থেকে পশ্চিমাদের টার্গেটে থাকা দীর্ঘ ৪২ বছরের অধিক লিবিয়ার শাসক গাদ্দাফী অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

[বিস্তারিত আগামী সংখ্যায়]

ফিলিস্তীনকে ইউনেস্কোর সদস্যপদ দিতে সম্মতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রক্তচক্ষু ও নিরাপত্তা পরিষদে ওবামার ভেটো দেয়ার হুমকি সত্ত্বেও গত ২৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পূর্ণ সদস্যপদের জন্য ফিলিস্তীন আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করে জাতিসংঘের কাছে। আবেদনপত্রটি জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুনের কাছে হস্তান্তর করেন ফিলিস্তীনের প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাস। তিনি এর মাধ্যমে ১৯৬৭ সালের পূর্ব সীমানা অনুযায়ী সার্বভৌম ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের মর্যাদা চান। নিরাপত্তা পরিষদে প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হ'লে আমেরিকার ভেটোর কারণে মাত্র দুই মিনিট আলোচনা চলে। এরপর আলোচনা ভেঙ্গে যায়। এদিকে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক শাখা 'ইউনেস্কো' ফিলিস্তীনকে তার সদস্যপদ দিতে প্রাথমিকভাবে সম্মত হয়েছে। এর মাধ্যমে ফিলিস্তীনীদের প্রথম কূটনৈতিক বিজয় অর্জিত হয়েছে বলে মনে করছেন কূটনীতিক মহল। তাদের আশা, এ স্বীকৃতির মাধ্যমে ফিলিস্তীন জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ লাভের ক্ষেত্রে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে। যদিও এ সদস্যপদ পাওয়ার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ মাসের (অক্টোবর) শেষে প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য ইউনেস্কোর সাধারণ পরিষদের সভায় ফিলিস্তীনের এ বিষয়টি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উত্থাপিত হবার কথা রয়েছে।

উল্লেখ্য, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য চীন ও রাশিয়া ফিলিস্তীনকে স্বীকৃতি দিলেও ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র এখনো স্বীকৃতি দেয়নি। আর সাধারণ পরিষদের মোট ১৯৩ সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১২২টি দেশ ইতিমধ্যে ফিলিস্তীনকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

হামাস-ইসরাঈল বন্দী বিনিময় চুক্তি : হামাসের হাতে আটক ইসরাঈলী সেনা গিলাদ শালিতের মুক্তির বিনিময়ে ১ হাযার ২৭ জন ফিলিস্তীনীকে মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছে ইসরাঈল। গাযা নিয়ন্ত্রণকারী হামাস শালিতকে ২০০৬ সালে সীমান্ত অঞ্চলে আটক করে। গত ১১ অক্টোবর ইসরাঈল ও হামাসের মধ্যে এ বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে গত ১৮ অক্টোবর প্রথম দফায় ৪৭৭ জন ফিলিস্তীনীকে মুক্তি দিয়েছে ইসরাঈল। দ্বিতীয় ধাপে শালিতের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর আগামী দু'মাসের মধ্যে আরো ৫৫০ ফিলিস্তীনীকে মুক্তি দিবে ইসরাঈল।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

দুধ থেকে কাপড়!

জার্মানির হ্যানোফোরের এক তরুণ ফ্যাশন ডিজাইনার বাড়ির ফ্রিজে সংরক্ষিত দৈনিক খাবার থেকেই কাপড় তৈরি করেছেন। আর খাবারটি হচ্ছে একটি জনপ্রিয় পানীয় 'দুধ'। দুধের মধ্যে থাকা প্রোটিনসমূহ ঘনীভূত করে তৈরি করা 'কিউ মিলচ' নামের এ কাপড়টি কোন রাসায়নিক ছাড়াই মানুষের হাতে তৈরি বিশ্বের প্রথম তন্তু। কিউ মিলচের উদ্ভাবক ২৮ বছর বয়সী আঙ্কে ডমাস্ক বলেন, এটা রেশমের মতো নরম ও কোন গন্ধ নেই। এটা ধোয়াও যাবে অন্য যেকোন কাপড়ের মতোই। তিনি জানান, এটি তৈরিতে অত্যন্ত ঘনীভূত ননী এবং কিছু প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করা হয়। প্রথমে গুঁড়োদুধ থেকে ননী আলাদা করে নিয়ে গোশত কিমা করার যন্ত্রের মতো একটি যন্ত্রের সাহায্যে তাপ প্রয়োগ করে অন্যান্য উপাদানগুলোর সঙ্গে মেশানো হয়, তন্তু বেরিয়ে আসতে শুরু করলে তা অন্য যন্ত্রের সাহায্যে গুটিয়ে নেয়া হয়। মাত্র ছয় লিটার দুধ থেকে একটি পোষাক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পুরো কাপড় পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে ৮৭ লাখ প্রজাতির প্রাণী আছে

সম্প্রতি কানাডার একদল গবেষক পৃথিবীতে কত হাযার প্রজাতির প্রাণী রয়েছে তা গবেষণা করে দেখতে পান যে, পৃথিবীর বুকে এ মুহূর্তে বাস করছে প্রায় ৮ দশমিক ৭ মিলিয়ন (৮৭ লাখ) প্রজাতির প্রাণী। এর মধ্যে ৭৮ লাখ প্রজাতি হ'ল মেরুদণ্ডী, স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ অথবা উভচর প্রাণী। ২ লাখ ৯৮ হাযার উদ্ভিদ; ৬ লাখ ১১ হাযার ফাংগাস; ৩৬ হাযার ৪০০ প্রটোজায়া এবং অ্যালগি ও জলজ প্রাণীসহ ২৭ হাযার ৫০০ ক্রোমিষ্ট রয়েছে। কানাডার ডালহৌসি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানান, ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৮৬ শতাংশ এবং সামুদ্রিক প্রায় ৯১ শতাংশ প্রজাতির প্রাণীকে এখনও নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। মোটকথা, সর্বশেষ এ গবেষণার ফলে দেখা গেছে, এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা প্রাণীজগতের ৯০ শতাংশ প্রাণীরই কোন সন্ধান দিতে পারেননি।

হীরের তৈরি গ্রহের সন্ধান

হীরের তৈরি একটি গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। পৃথিবী থেকে ৪ হাযার আলোকবর্ষ দূরে এই গ্রহের সন্ধান মিলেছে। এই গ্রহে হীরা রয়েছে অত্যন্ত ঘনীভূত অবস্থায়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, নতুন এই গ্রহের ঘনত্ব প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে কমপক্ষে ২৩ গ্রাম। এই ঘনত্ব সীসার চেয়ে দ্বিগুণ। এই গ্রহটি একটি কার্বন সমৃদ্ধ সাদা বামন নক্ষত্র। এর অন্তর্বর্তী চাপ অত্যন্ত বেশি। আর এই অত্যধিক চাপের কারণেই কার্বন ঘনীভূত হয়ে হীরার স্ফটিকে রূপ নিতে পারে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, নতুন এই হীরার গ্রহটির ব্যাস ৫৫ হাযার কিলোমিটার বা পৃথিবীর ব্যাসের পাঁচগুণ হ'তে পারে। কার্বনের পাশাপাশি এর পৃষ্ঠে অধিক পরিমাণে অক্সিজেন থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সূর্যের আলোকে জ্বালানীতে রূপান্তরের কৃত্রিম পাতা

মার্কিন বিজ্ঞানীরা একটি 'কৃত্রিম পাতা' আবিষ্কার করেছেন, যা সূর্যের আলোকে জ্বালানীতে রূপান্তরিত করে। এটি পরবর্তীতে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রত্যেক পাশে অনুঘটক পদার্থ লাগিয়ে সিলিকন সোলার সেলকে পানি ভর্তি একটি কন্টেইনারে রাখা হ'লে এর এক পাশে অক্সিজেনের বুদবুদ এবং অপর পাশে হাইড্রোজেনের বুদবুদ উৎপাদিত হয়- যা পৃথক ও সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই গ্যাসকে একটি জ্বালানী সেলে ঢুকালে তা পুনরায় পানিতে রূপান্তরিত হয়। এ সময় একটি বৈদ্যুতিক স্রোতের সৃষ্টি হয়। এই 'পাতা' খুবই কমদামী পদার্থ দিয়ে তৈরী।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

দেশব্যাপী ২০১১-১৩ সেশনের যেলা কর্মপরিষদ পুনর্গঠন

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০১১-২০১৩ সেশনের জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মজলিসে আমেলা ও শূরা পুনর্গঠন করা হয় এবং একই দিনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বিভিন্ন যেলার সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনয়ন দেন ও সকলের নিকট থেকে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর গঠনতন্ত্রের নিয়ম মোতাবেক ৩০ দিনের মধ্যে সাংগঠনিক যেলা সমূহের কর্মপরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। যার বিবরণ নিম্নরূপ-

নওগাঁ ২৮ সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ যোহর পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাষ্টার আনীসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর নবনিযুক্ত কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কর্মী ও আত্রাই অগ্রণী কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক মুহাম্মাদ মুবীনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শহীদুল আলম এবং অন্যান্য কর্মী ও উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ ২৮ সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর কুড়িগ্রাম সদর থানাধীন মাষ্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আলহাজ্জ আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুনতাযির রহমান। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আলহাজ্জ আব্দুর রহীম ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান এবং অন্যান্য কর্মী ও উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

লালমণিরহাট ২৮ সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ এশা মহিষখোচা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমান, সহ-সভাপতি মাওলানা মাহবুবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুনতাযির রহমান এবং অন্যান্য কর্মী ও উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

সাতক্ষীরা ২৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর কদমতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন এবং অন্যান্য কর্মী ও উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

কুড়িগ্রাম-উত্তর ২৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার নাগেশ্বরী উপযেলাধীন গোপালপুর (ডাঙ্গীরপাড়া) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আযীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুনতাযির রহমান। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি আলহাজ্জ আযীযুর রহমান, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইন এবং অন্যান্য কর্মী ও উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

পঞ্চগড় ৩০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব ফুলতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল আহাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ এবং অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল আহাদ, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ তাযীমুদ্দীন ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর খান এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

দিনাজপুর-পশ্চিম ৩০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর লালবাগ-১ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ এবং অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলী, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফসার আলী ও সাধারণ সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ আবদুল কাহ্হার এবং অন্যান্য কর্মী ও উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

বগুড়া ৩০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর গাবতলী পুরান বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, সহ-সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম এবং অন্যান্য কর্মী ও উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

ঝিনাইদহ ১ অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান

অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইন, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

নীলফামারী ১ অক্টোবর শনিবার : অদ্য বেলা ৩-টায় জলঢাকা প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ এবং অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি আলহাজ্জ ওছমান গণী, সহ-সভাপতি মাওলানা সাইফুয্যামান সালাফী ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

ঢাকা ১ অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব রাজধানীর বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান, সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মোশাররফ হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

গাইবান্ধা-পূর্ব ১ অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ আছর বারকোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি আহসান আলী প্রধান, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়। [পরে ৭ই অক্টোবর সভাপতির আকস্মিক মৃত্যুর পর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান সভাপতি নিযুক্ত হন।]

গাইবান্ধা-পশ্চিম ২ অক্টোবর রবিবার : অদ্য বাদ যোহর গোবিন্দগঞ্জ টিএণ্ডটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা প্রধান উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধান ও বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদ, সহ-সভাপতি মাওলানা হয়দার আলী ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মাহতাবুদ্দীন এবং অন্যান্য কর্মী ও উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

রংপুর ২ অক্টোবর রবিবার : অদ্য বাদ যোহর বদরগঞ্জ মণ্ডলপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার খায়রুল আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এএসএম আযীযুল্লাহ এবং অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি মাষ্টার খায়রুল আযাদ, সহ-সভাপতি আব্দুল হাদী মাষ্টার ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

কুষ্টিয়া-পশ্চিম ২ অক্টোবর রবিবার : অদ্য বাদ আছর দৌলতপুর থানা বাজারস্থ যেলা কার্যালয়ে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়া, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ নাযীর খান ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম মাষ্টার এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

কুষ্টিয়া-পূর্ব ৩ অক্টোবর সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় কুষ্টিয়া সদর উপযেলা জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা কাযী আব্দুল ওয়াহ্হাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম এবং গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি মাওলানা কাযী আব্দুল ওয়াহ্হাব, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ হাশীমুদ্দীন সরকার ও সাধারণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ আমীনুদ্দীন এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

কুমিল্লা ৩ অক্টোবর সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব কোরপাই বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন এবং অন্যান্য কর্মী ও উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

মেহেরপুর ৪ অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় মেহেরপুর শহরের গোভীপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর শহর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনা বাহারুল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা নূরুল

ইসলাম, সহ-সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তারীকুয্যামান এবং অন্যান্য কর্মী ও উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

জয়পুরহাট ৪ অক্টোবর সোমবার : অদ্য বাদ যোহর তালশন (ঠনঠনিয়া) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

পাবনা ৫ অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ যোহর চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ শিরীন বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুস সোবহান এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

সিরাজগঞ্জ ৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বেলা ১২-টায় যেলার সদর থানাধীন জগৎগাতি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তযা আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তযা, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ শফিউল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলাতাফ হোসাইন এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

রাজশাহী ৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি ডা. ইদ্রীস আলী, সহ-সভাপতি ডা. মানছূর আলী ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

গাযীপুর ৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর মণিপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, সহ-সভাপতি কাযী মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

রাজবাড়ী ৭ অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ পাংশা উপযেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মকবূল হোসাইন, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী খান এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

নরসিংদী ৭ অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা কাযী মুহাম্মাদ আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও কুমিল্লা যেলা সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি মাওলানা কাযী মুহাম্মাদ আমীনুদ্দীন, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আমীর হামযাহ ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইন এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

যশোর ৭ অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় শহরের ষষ্ঠীতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল খায়ের ও সাধারণ সম্পাদক আ.ন.ম. বযলুর রশীদ এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

টাঙ্গাইল ৮ অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর শহরের ভবানীপুর-পাতুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা ইউসুফ আলী। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি জনাব আব্দুল ওয়াজেদ, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান মাষ্টার ও সাধারণ সম্পাদক হারূণ ইবনে রশীদ এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৮ অক্টোবর শনিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৯-টায় রহনপুর ডাকবাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি

মাওলানা আব্দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ, সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল লতীফ ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

জামালপুর-দক্ষিণ ৯ অক্টোবর রবিবার : অদ্য বাদ আছর সরিষাবাড়ী থানাধীন সিঙ্গুয়া বড় জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান, সহ-সভাপতি মাওলানা খলীলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

নাটোর ১১ অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর বড়াইগ্রাম থানাধীন মালিপাড়া (বনপাড়া) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত কর্তৃক মনোনীত সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ণ যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয় ও তাদের শপথ নেওয়া হয়।

বিশেষ আলোচনা সভা

নজরপুর, নরসিংদী ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ২৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বাদ আছর নরসিংদী সদর থানাধীন নজরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী যেলার যৌথ উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী আলোচনা সভা শুরু হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মাওলানা কাযী আমীনুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আমীর হামযাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফূযুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সাত্তার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক মুছল্লী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান বৃহস্পতিবার বাদ আছর শুরু হয়ে শুক্রবার জুম'আ পর্যন্ত চলে।

যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ

রাজশাহী ১৩ ও ১৪ অক্টোবর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ১৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বাদ ফজর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে নব মনোনীত কর্মীদের নিয়ে দু'দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ শুরু হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, যুবসংঘের চারটি কর্মসূচীর মধ্যে প্রধান হ'ল সমাজ সংস্কার। এজন্য সবচেয়ে প্রয়োজন হ'ল চারটি বিষয় : ইলমী যোগ্যতা, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা, নিরন্তর দাওয়াতী তৎপরতা ও ইমারতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও ভালোবাসা। যদি প্রতি যেলায় এ ধরনের নিবেদিতপ্রাণ কিছু কর্মী জান-মাল বাজি রেখে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাছিলের লক্ষ্যে ময়দানে কাজ করে, তাহ'লে এ সমাজ একদিন সত্যিকারের ইসলামী সমাজে পরিবর্তিত হবেই ইনশাআল্লাহ। তিনি 'যুবসংঘে'র নবমনোনীত কর্মীদের ধন্যবাদ জানান ও তাদের জন্য দো'আ করেন।

দু'দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, অত্র মাদরাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল হালীম প্রমুখ। বৃহস্পতিবার বাদ ফজর শুরু হয়ে শুক্রবার জুম'আর পূর্ব পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলে। প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষায় ১ম হন আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (রাজশাহী), ২য় আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া) ও ৩য় স্থান অধিকার করেন আহমাদুল্লাহ (কুমিল্লা)। মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ও দো'আ করেন।

সেমিনার

পাংশা, রাজবাড়ী ৭ অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ পাংশা উপযেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজবাড়ী যেলার উদ্যোগে 'আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে আহলেহাদীছ যুবসংঘের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পাংশা উপযেলা চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ হাসান আলী বিশ্বাস। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি ও বর্তমানে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ড. মুহাম্মাদ আতাউর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মকবূল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাযযাক, যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক যাকির হোসাইন ও সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হেনা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আতাউর রহমান। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক সুধী যোগদান করেন।

হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল ও আত-তাহরীক সম্পাদকের সঊদী আরব গমন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম গত ১১ অক্টোবর মঙ্গলবার সকাল পৌনে ১০-টায় এবং মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ১৪ অক্টোবর শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ৯-টার ফ্লাইটে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে সঊদী আরব গমন করেছেন। তাঁরা সকলের নিকট দো'আ প্রার্থী।

মৃত্যু সংবাদ

(১) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা আহসান আলী প্রধান (৫০) গত ৭ই অক্টোবর শুক্রবার বিকেলে স্থানীয় জুমারবাড়ী বাজারের নিকটে হোণ্ডা-ভ্যান এক্সিডেন্টে আহত হয়ে রাত সাড়ে ৩-টায় বগুড়ার ডক্টরস ক্লিনিকে ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে গেছেন। পরদিন ৮ অক্টোবর দুপুর ২-টায় তার নিজ গ্রাম বাদিনারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জানাযা ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মোফাক্ষার হোসাইন, 'আন্দোলন'-এর বগুড়া যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদ ও 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর সভাপতি হাফেয মুকাররম বিন মুহসিন প্রমুখ। জানাযায় আলেম-ওলামা ও উপযেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার সাবেক সহ-সভাপতি কাকডাঙ্গা সিনিয়র ফাযিল মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা ছহীলুদ্দীন (৬৩) গত ৮ই অক্টোবর সকাল ৭-টায় ইন্তেকাল করেছেন। *ইন্না লিল্লাহি...*। ৬ই অক্টোবর বেলা ১১-টার দিকে সাতক্ষীরা কালিগঞ্জ মহাসড়কের আলিপুর নাথপাড়া নামক স্থানে হোন্ডা-মাইক্রো এক্সিডেন্টে মারাত্মক আহত অবস্থায় সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে নীত হন। প্রায় ২দিন অজ্ঞান থাকার পর ৮ই অক্টোবর সকালে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি ২ স্ত্রী, ৬ ছেলে, ৩ মেয়ে, বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। ঐ দিন বাদ যোহর কাকডাঙ্গা মাদরাসা প্রাঙ্গনে তাঁর প্রথম ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসার সাবেক সহকারী শিক্ষক মাওলানা মুনীরুল হুদা। কাকডাঙ্গা মাদরাসার অধ্যক্ষ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মচারী, যেলা, উপযেলা, এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীল, স্থানীয় আলেম-ওলামা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। মৃতের ২য় জানাযা অনুষ্ঠিত হয় বাদ আছর আলিপুর সেন্ট্রাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে। উক্ত জানাযায় ইমামতি করেন মৃতের ৪র্থ পুত্র 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক ও দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসার সহকারী শিক্ষক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। মৃতের সর্বশেষ জানাযা তাঁর বাসভবনে রাত ২-টায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এ সময় উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মোফাক্ষার হোসাইন ও 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর সভাপতি হাফেয মুকাররম বিন মুহসিন এবং সাতক্ষীরা যেলা সংগঠনের দায়িত্বশীল ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। উল্লেখ্য যে, একই দিনে গাইবান্ধা-পূর্ব যেলা সভাপতির জানাযায় অংশগ্রহণ শেষে আমীরে জামা'আত একটানা সফরে সাতক্ষীরা আসেন। তিনি মৃতের পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দেন ও ধৈর্যধারণের উপদেশ দেন।

(৩) মাসিক আত-তাহরীক-এর সাবেক সার্কুলেশন ম্যানেজার আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান (৩৮) গত ২০শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার বিকাল ৪-টায় বগুড়া থেকে মহিমাগঞ্জ যাওয়ার পথে ট্রেন থেকে নেমে হেটে যাওয়ার সময় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে হঠাৎ ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লাহি...*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ৩ শিশুকন্যা রেখে গেছেন। পরদিন ২১ অক্টোবর সকাল সাড়ে ১০-টায় তার নিজ গ্রাম কুন্দপাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জানাযা ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন তার ৪র্থ ভাই আবু নো'মান। জানাযায় উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম ও আত-তাহরীকের সহকারী সার্কুলেশন ম্যানেজার মুহাম্মাদ কামরুল হাসান। এছাড়া যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাকে নিজ গ্রামের গোরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি জানুয়ারী '৯৯ থেকে জুলাই ২০০৮ পর্যন্ত মাসিক আত-তাহরীকের সার্কুলেশন ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। এর পূর্বে তিনি গাইবান্ধার একটি স্থানীয় পত্রিকায় কাজ করতেন। সেখান থেকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাকে নিয়ে এসে আত-তাহরীক-এর সার্কুলেশন ম্যানেজার হিসাবে নিয়োগ দেন। তার আকস্মিক মৃত্যুতে মুহতারাম আমীরে জামা'আত দারুণভাবে মর্মাহত হন এবং তার পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তার ছোটভাই 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক তাবলীগ সম্পাদক ও বর্তমানে সঊদী আরবে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে অবস্থানরত মাওলানা আবু তাহেরের সঙ্গে ও তার অপর ভাইদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে সান্ত না দেন। একইভাবে বর্তমানে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে সঊদী আরবে অবস্থানরত আত-তাহরীক-এর মাননীয় সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসায়েন টেলিফোনে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিকট তার মৃত্যুতে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

এতদ্ব্যতীত সম্প্রতি অল্পদিনের ব্যবধানে মৃত্যুবরণ করেন যথাক্রমে (১) আমীরে জামা'আতের ভাগিনা মুহাম্মাদ বদরুযযামান (মানিকহার, সাতক্ষীরা) ১১ই অক্টোবর মঙ্গলবার (২) সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর গত সেশনের সেক্রেটারী মুযাফফর রহমানের পিতা ১৩ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার (৩) সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমানের মাতা ২০শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার এবং (৪) চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর বর্তমান সেশনের সেক্রেটারী ডাঃ শামীম আহসানের পিতা ২১শে অক্টোবর শুক্রবার। *ইন্না লিল্লাহি....*।

[আমরা তাঁদের সকলের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক]

মতামত

ইসলামী বিচারব্যবস্থার যৌক্তিকতা : প্রসঙ্গ সঊদী আরবে ৮ বাংলাদেশীর মৃত্যুদণ্ড

*আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব**

ইসলামী বিচারব্যবস্থায় শাস্তির কঠোরতা প্রসঙ্গে 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকায় ভিন্ন শিরোনামে ইতিপূর্বে একটি সংক্ষিপ্ত লেখা লিখেছিলাম। সম্প্রতি সঊদী আরবে একটি হত্যা মামলায় দোষী সাব্যাস্ত হয়ে ৮ জন বাংলাদেশীর শিরচ্ছেদের ঘটনায় প্রসঙ্গটি আবার উঠে আসায় সেখানকার আলোচনাটি এখানে পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে। বিষয়টি ছিল ইভটিজিং-এর প্রতিবাদ করায় নাটোরের কলেজ শিক্ষক মিজানুর রহমানের হত্যাকারী দুর্বৃত্ত রাজনের কি ধরনের শাস্তি হওয়া দরকার এ নিয়ে শীর্ষস্থানীয় জনপ্রিয় এক বাংলা সামাজিক সাইটের সদস্যদের করা কিছু মন্তব্য নিয়ে। যার নমুনা ছিল এমন– 'না মরা পর্যন্ত গণধোলাই'...'সবার সামনে গুলি করে মারা কিংবা একবারে শিরচ্ছেদ'...'ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে মারা উচিৎ এবং সেটি সকল টেলিভিশনে বাধ্যতামূলক লাইভ টেলিকাস্ট করা হোক। আমি প্রশাসনে থাকলে সেটাই করতাম'....'জনসম্মুখে ফাঁসি চাই। তার আগে মুক্ত গণধোলাই'....'মিজানকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে সেভাবে হত্যা করা হোক'...'ডগ স্কোয়াডে দিতে হবে এবং কামড় খাওয়াতে হবে না মরা পর্যন্ত'... 'যতদ্রুত সম্ভব মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করতে হবে'... 'ট্রাকের পিছনে দড়ি বেঁধে সারাদেশে ঘুরাতে হবে যাতে তার বীভৎস চেহারা দেখে কেউ এমন কাজ করার আর চিন্তাও না করে। আমার ক্ষমতা থাকলে আল্লাহ্র কসম আমি তাই করতাম ঐ ঘৃণ্য নরপশুদের'...'প্রকাশ্য জনসম্মুখে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা উচিৎ যাতে ভবিষ্যতে আর কোন নরপশুর জন্ম না হয়'...। আরো যে সব মন্তব্য রয়েছে তা ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়।

উপরোক্ত মন্তব্যগুলো পড়লে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় ঐ মর্মান্তিক ঘটনা মানুষের মনে কিরূপ তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল। ফলে এমন কোন উচ্চতম শাস্তির কথা অবশিষ্ট নেই যা মন্তব্যদাতারা উল্লেখ করতে কসুর করেছেন। অথচ তাদের কেউই কিন্তু নিহত মিজানের আত্মীয় বা পাড়া-প্রতিবেশী নন। নিতান্তই অপরিচিত এসব লোকজন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসব মন্তব্য করেছেন। একবার চিন্তা করুন, যে পরিস্থিতিতে একজন অনাত্মীয়-অপরিচিত ব্যক্তির অন্তরে নিহত ব্যক্তির জন্য এতটা প্রতিক্রিয়া জন্ম নেয় সেখানে নিহত ব্যক্তির যারা একান্ত পরিবার-পরিজন তাদের মানসিক অবস্থা কেমন হতে পারে? কত তীব্র হতে পারে তাদের প্রতিক্রিয়া? অবশ্যই অবশ্যই বহুগুণ বেশি। নিশ্চয়ই তারা কামনা করবেন তাদের কল্পনায় ভাসা সর্বোচ্চ শাস্তিটাই।

উপরোক্ত ঘটনায় আরো লক্ষ্যণীয় যে, মন্তব্যদাতারা প্রত্যেকেই শিক্ষিত ও আধুনিক সুশীল সমাজের মানবতাবাদী প্রতিনিধি হিসাবে গর্ববোধ করেন এবং তাদের অধিকাংশেরই দাবী, হত্যাকারীর শাস্তি জনসম্মুখে প্রকাশ্যে কার্যকর করা হোক যাতে ভবিষ্যতে এমন কাজ করার কেউ চিন্তাও না করে। এক্ষণে এই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবীর পিছনে এতগুলো লোকের যে স্বতঃস্ফূর্ত এবং কঠোরতম অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে তা কি অবাস্তব, অস্বাভাবিক কিংবা আবেগীয় বলে উড়িয়ে দেয়া যায়?

প্রিয় পাঠক, উপরোক্ত প্রেক্ষাপট থেকেই চিন্তা করুন ইসলামী বিচারব্যবস্থার যৌক্তিকতা। সুস্পষ্টত:ই এটা প্রতিভাত হবে যে, মানবপ্রবৃত্তির যে স্বাভাবিক দাবী তার মাঝেই ইসলামী বিচারব্যবস্থার আপাত কঠোর শাস্তি নীতির প্রাসঙ্গিকতা নিহিত। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার চরম উন্নতির যুগে তুমুল উৎসাহের সাথে হরহামেশাই প্রচারিত হচ্ছে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কি রকম বর্বর তার প্রকাশ্য কিংবা আকার-ইঙ্গিতের বিবরণ। যারা কিছুটা সংযমী তারাও আল্লাহ্র আইনকে কেবল মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থার জন্য উপযোগী ছিল বলে পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্য করে নিজেদেরকে আধুনিক জাহির করেন। অথচ কেতাদুরস্ত বিতর্কের বাইরে বাস্তবতায় এসে উপরোক্ত ঘটনায় এই তাদেরই স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহের ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কৃত্রিমতার খোলস ঠেলে ক্ষণিকের জন্য হলেও তারা বাস্তবতার আলোয় একাকার হয়েছেন। একই সাথে ইসলামের কঠোর বিচারব্যবস্থার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকেও অবচেতনভাবে উচ্চকিত করেছেন।

প্রসঙ্গটি উঠেছে সম্প্রতি সঊদী আরবে ৮ জন বাংলাদেশী নাগরিকের শিরচ্ছেদ নিয়ে। যে ঘটনাটি বাংলাদেশী মিডিয়া ও সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি বহুল আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুঃখের বিষয় হল, এক্ষেত্রে আলোচনা উঠতে পারত এ ঘটনায় দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হওয়া প্রসঙ্গে অথবা বড়জোর এ ঘটনায় বিচারিক প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুসৃত হয়েছিল কি না সে সম্পর্কে, অথচ মূল আলোচনা থেকে সরে গিয়ে ইসলামী আইন কেমন বর্বর, তা নিয়ে ক'দিন মাঠ সরগরম করেছে বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ আন্তর্জাতিক কয়েকটি মানবাধিকার সংস্থা এবং তাদের ধ্বজাধারীরা। আর সাথে সাথে ঝড় উঠেছে বাংলাদেশী প্রিন্ট মিডিয়াসহ বিকল্প মিডিয়া হয়ে উঠা সামাজিক সাইটগুলোতেও। রাজধানীর শাহবাগে মিছিল-মিটিংও করেছে কয়েকটি সামাজিক সংগঠন। ফলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়ে যাচ্ছে এবং ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার শিকার হচ্ছে। ইদানিং সঊদী আরবে কোন ঘটনা ঘটলেই তার সাথে ইসলামকে মিশিয়ে বিশ্ব মিডিয়ার শোরগোল তোলা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এই মায়াকান্না যে তারই অংশ তা বলাই বাহুল্য। এসব শঠ মানবতাবাদীর কাছে ভিকটিমের চাইতে অপরাধীর অধিকার অনেক বেশী মূল্যবান। সমাজকে অপরাধমুক্ত করার চাইতে অপরাধ এবং অপরাধীকে প্রতিরক্ষা দেয়াই যেন তাদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন এই শিরচ্ছেদের ঘটনায় তাদের তোলা কিছু প্রশ্ন যা নিম্নে আলোচিত হল।

(১) মানবাধিকার সংস্থাগুলোর দাবী হল, এই বাংলাদেশীদের সাজা মওকুফের জন্য কি রাষ্ট্রীয়ভাবে সঊদী সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা যেত না? এই দাবী যে কতটা অযৌক্তিক তা প্রশ্নেই সুস্পষ্ট। তারা কি আইনের শাসনে বিশ্বাস করে না? অপরাধীকে শাস্তিদানের নীতিতে আস্থা রাখেন না? তবে কেন চাপ সৃষ্টি করতে হবে? ঐ দণ্ডপ্রাপ্তরা কি নিরপরাধ ছিল? তারা তো অপরাধ করেই ধরা পড়েছে। এর জন্য প্রচলিত আইনেই

তাদের বিচার হয়েছে এবং দীর্ঘ আইনী প্রক্রিয়ার পর দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছে। জেনে বুঝে যারা অপরাধ করেছে এবং শাস্তির যোগ্য হয়েছে তাদের সাজার বিপক্ষে কথা বলা বা সাজা মওকুফের দাবী তুলতে হবে কেন? আপনার পিতা বা সন্তান এমনভাবে নিহত হলে আপনার দরদ এভাবে উথলে উঠত? আপনি কি চিন্তা করেছেন, অপরাধীর প্রতি আপনার এই 'দরদ' নিহতের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের অধিকারের প্রতি কিভাবে অবজ্ঞা প্রদর্শন করল? এই তো কিছুদিন পূর্বে যখন প্রেসিডেন্ট যিল্লুর রহমান লক্ষ্মীপুরের বিএনপি নেতা নূরুল ইসলামের হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিলেন, তখন নিহত নূরুল ইসলামের স্ত্রীর কথা কি মনে পড়ে? তিনি বলেছিলেন, 'প্রেসিডেন্ট কি পারবেন তাঁর স্ত্রী আইভীর খুনীদের ক্ষমা করতে?' একই প্রশ্ন যদি আপনাকেও করা হয়, আপনার উত্তর কি হবে? নাকি দোষীরা ইসলামী আইনে শাস্তি পেয়েছে– এটাই আপনাদের মেকি দরদের মূল উৎস? এটাই আপনাদের অন্তর্জ্বালা?

মানবাধিকার সংস্থাগুলো বড়জোর দাবী করতে পারত যে, বিচারিক প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুসৃত হয়েছে কি না তা যাচাই করা। কিন্তু তা না করে অপরাধীদের সাজা মওকুফের যে হাস্যকর দাবী যারা তুলেছেন তার মাধ্যমে প্রকারান্তরে তারা নিজেরাই কি মানবাধিকার লংঘন করছেন না? দেশের বিচারালয়গুলোতে দুর্বল, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থাপনার কারণে যখন শত শত খুনী অবলীলায় বেরিয়ে যেয়ে আবার অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে। আর নিহতের পরিবারের আহাজারিতে গ্রাম-গঞ্জের আকাশ বাতাস মাতম করছে। তখন আপনাদের কানে ঠুলি পড়ে থাকে। যখন দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী হায়নাদের আগ্রাসনে লক্ষ-কোটি মানুষ নির্বিচারে মরছে, তখন আপনাদের ন্যায়ের কণ্ঠ থাকে নিশ্চুপ। আর কয়েকজন সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্ত অপরাধ করে শাস্তি পেয়েছে তাতেই এত মায়াকান্না? ধিক, আপনাদের মানবতাবোধ! মাযলূমের কাছে, বিবেকের কাছে, মানবতার কাছে আপনারা নিজেদেরকে চরম মুনাফিক হিসাবে প্রমাণ করেছেন। আপনাদের এই মায়াকান্নার জন্য ন্যায়ের বাণী কখনোই ভূলুণ্ঠিত হতে পারে না, কখনই নিহত মাযলূম ব্যক্তির ন্যায়বিচার পাবার অধিকার ক্ষুণ্ণ হতে পারে না।

(২) তারা প্রশ্ন তুলছেন, শিরচ্ছেদের মত অমানবিক প্রথা আধুনিক সমাজে কিভাবে বৈধতা পায়? এর উত্তরে বলতে হয়, একজন মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় যে পদ্ধতিতেই হত্যা করা হোক না কেন, যে কোন বিবেচনায় তা 'অমানবিক'ই বটে। তা ফাঁসির মাধ্যমেই হোক, ডার্ক রুমে ইঞ্জেকশন পুশ করেই হোক আর প্রকাশ্যে শিরচ্ছেদের মাধ্যমেই হোক। কিন্তু সমাজের শান্তি-শৃংখলা রক্ষার্থে এই 'অমানবিকতা' আমাদেরকে স্বীকার করে নিতেই হয়। এমনকি বলতে হয় যে, মানবতা সংরক্ষণের জন্য এই 'অমানবিকতা'র কোন বিকল্প নেই। তাই অনাদিকাল থেকেই মানবসমাজে মৃত্যুদণ্ডের বিধান প্রচলিত রয়েছে এবং থাকবে। এক্ষণে অপরাধীর জন্য এতটুকুই করণীয় যে, যত কম কষ্ট দিয়ে সম্ভব তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা। মৃত্যদণ্ডের আর যে কোন প্রক্রিয়ার চেয়ে শিরচ্ছেদ মোটেই অধিক যন্ত্রণাদায়ক নয়, বরং কম। কেননা এটা স্বতসিদ্ধ যে, মানুষের নার্ভ সিস্টেম চালিত হয় ব্রেন থেকে। মস্তিষ্কে কোন অনুভূতি না পৌঁছানো পর্যন্ত সেই অনুভূতিটা মানুষ অনুভব করে না। সেই কারণে মস্তিষ্কই সবকিছুর মূল বিষয়। যখন মানুষ কোন আঘাত পায় সেটার অনুভূতিটা মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে যায় নার্ভ সিস্টেম। আর সকল নার্ভ সিস্টেম মানুষের ঘাড়ের স্পাইনাল কর্ডের ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কে চলে গিয়েছে। এখন যদি কারো ঘাড়ের স্পাইনাল কর্ডে নার্ভ সিস্টেম কাটা পড়ে, তখন মস্তিষ্ক পর্যন্ত সেই আঘাতের অনুভূতি পৌঁছতে পারে না বা মানুষ সেই অনুভূতি বুঝতে পারে না। সেই কারণে যদি কাউকে শিরচ্ছেদ করা হয় তখন তার কোন অনুভূতি মস্তিষ্কে যেতে পারে না। ফলে উক্ত ব্যক্তি কোন কিছুই অনুভব করতে পারে না। সুতরাং শিরচ্ছেদ দৃশ্যত: যত বিভৎসই মনে হোক না কেন, এটা কোন যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর উদাহরণ নয়।

(৩) তারা বলেন, 'জনসম্মুখে প্রকাশ্যভাবে শাস্তি কার্যকর করা মধ্যযুগীয় বর্বরতা। এ লোমহর্ষক এই দৃশ্য মানুষের মনে নেগেটিভ অবসেশন ও স্নায়ুবিক বৈকল্যের সৃষ্টি করে।' যারা এই কথা বলেন তাদের উদ্দেশ্য কেবল ইসলামী আইনের বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা যে 'সভ্য' সমাজ এই ধরণের যুক্তি দেয় সেই সমাজেই সভ্যতার নামে স্নায়ুবিক বৈকল্য সৃষ্টির জন্য হাযারো উপকরণ বিদ্যমান। মুভি-সিনেমা থেকে শুরু করে ছোট্ট দুধের শিশুর জন্য তৈরী গেমসেও পর্যন্ত সেখানে প্রতিনিয়ত ভায়োলেন্স শেখানো হয়, আর মানুষ হত্যার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। হরর সিনেমা ও উপন্যাসের নামে কোমলমতি শিশুদের আধিভৌতিক কল্পনার জগতে বিচরণ করানো হচ্ছে, যার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া নিয়ে মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা প্রতিদিনই লেখালেখি করছেন। অথচ মানবাধিকারকর্মীদের নযর কেবল ইসলামী বিধানের প্রতি। মূলতঃ ইসলামী আইনে শাস্তি প্রদানের অর্থ কেবল অপরাধীর অপরাধের শাস্তি কার্যকর করা নয়। বরং সমাজকে অপরাধ থেকে বিরত রাখাই এর উদ্দেশ্য। এজন্য অপরাধীকে সকলের অগোচরে শাস্তি না দিয়ে প্রকাশ্যে শাস্তি দেয়া হয়, যেন এর মাধ্যমে জনমনে অপরাধের ভয়ংকর পরিণতির দৃষ্টান্তমূলক চিত্র অংকিত হয়ে যায়। রাষ্ট্র কর্তৃক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও মজলুমের অধিকার প্রতিষ্ঠার এ দৃশ্য যখন মানুষ স্বচক্ষে দেখবে তখন তাদের মধ্যকার অপরাধপ্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পাবে। সমাজে নৈতিক শিক্ষার সাথে যদি এই শাস্তির ভীতি যোগ না করা হয় তবে অপরাধ কখনই দূর করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে গোপনে শাস্তি মূলতঃ অপরাধকে এবং অপরাধীকে সমাজের আড়াল করারই শামিল; যা আর যাই হোক সমাজ থেকে অপরাধ দূরিকরণে স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে না, যেমনটি পারে প্রকাশ্য শাস্তি। সুতরাং এই আইনকে বর্বরতা আখ্যা দিয়ে যারা সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থকে জলাঞ্জলী দেওয়ার আহবান জানায় তারা নিজেরাই যে প্রকৃতপক্ষে মানবাধিকার লংঘনকারী, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

(৪) ১ জনের বদলে ৮ জনের মৃত্যুদণ্ড–এ কেমন বিধান? এ ধরণের স্থূল প্রশ্নও তুলেছেন আমাদের মানবাধিকার কর্মীরা। এমনকি বিবিসিতেও তা প্রচারিত হয়েছে। মনে হচ্ছে সঊদী আরবে আইন-কানুন বলে কিছু নেই, শুধু ধরে ধরে মানুষ হত্যাই তাদের কাজ। এতে ইসলামী আইনের প্রতি তাদের বিদ্বেষের মাত্রা কোথায় পৌঁছিয়েছে, তা অনুমান করা যায়। নতুবা বিষয়টিকে একক অপরাধে ৮ জনের সমভাবে যুক্ত থাকার উপর বিচার না করে ১ ঃ ৮ (১ জনের মৃত ঃ ৮ জনের শাস্তি) -এর মত সরল সমীকরণ মিলানোর বালখিল্যতায় তারা নামত না। একজনের হত্যাকাণ্ডে ৮ জন ব্যক্তির সম্পৃক্ত থাকা কি অসম্ভব? যদি সম্পৃক্ত থাকে তাহলে সেই মোতাবেক ৮ জন কেন ৮০০ জনও যদি এই অপরাধে

সম্পৃক্ত হয় তবুও তাদের প্রত্যেককে অপরাধের তারতম্য অনুযায়ী শাস্তি প্রদানই কি ন্যায়বিচারের দাবী নয়? এতে সংশয়ের কি আছে তা আমাদের কাছে অবোধগম্য।

এবারে আসুন দেখা যাক ইসলামী আইনে ক্বিছাছের মূল তাৎপর্য সম্পর্কে কুরআনে কী বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে ক্বিছাছ গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। হে বুদ্ধিমানগণ! কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার *(বাক্বারাহ ১৭৮-১৭৯)*।

পবিত্র কুরআনের কিসাস সংক্রান্ত আয়াতটি পড়লেই বুঝা যায় কুরআনের এই আইনটি কতটা মানবতাপূর্ণ এবং সামাজিক মানুষের অবস্থার সাথে কতটা সংগতিশীল। মানবাধিকারের দিকটি বিবেচনা করলে আয়াতে দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়–

১. এই আয়াত নিহত ব্যক্তির অধিকার পুরোপুরিভাবে সংরক্ষণ করেছে। মাযলুম ব্যক্তিটির পরিবার যদি হত্যাকারীকে ক্ষমা না করে তবে পৃথিবীর কোন শক্তির যেমন ক্ষমতা নেই যে হত্যাকারীকে রক্ষা করবে, তেমনি যদি নিহতের পরিবার হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে রাষ্ট্রের সেখানে কিছুই বলার নেই।

২. এখানে হত্যাকারীর অধিকারও সংরক্ষিত হয়েছে। সে যদি নিজের ভুল বুঝতে পারে অথবা কোন কারণে অন্যায় বিচারের শিকার হয় তবে নিহতের পরিবারের কাছে তার মাফ চেয়ে নেয়ার অধিকার পুরোপুরি সংরক্ষিত রয়েছে। যদি সে নিহতের পরিবারকে যুক্তিসংগত কারণ দেখিয়ে রক্তপণ দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে পারে তবে তাতেও রাষ্ট্রের আপত্তি থাকে না।

পৃথিবী আর কোন আইনে বা বিচার-ব্যবস্থায় একইসাথে এভাবে হত্যাকারী ও নিহত উভয়ের অধিকার পূর্ণ সংরক্ষণের কোন বাস্তব নযীর কি কেউ দেখাতে পারবেন?

আয়াতের শেষে আল্লাহ এই আইন প্রয়োগের যৌক্তিকতা দেখিয়ে চমৎকারভাবে বলেছেন, 'হে বুদ্ধিমানগণ! ক্বিছাছের মধ্যে তোমাদের জন্যে রয়েছে জীবন, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।' কি অসাধারণ কথা! একটি ক্বিছাছ বাস্তবায়ন তথা ১ জন হত্যাকারীর জীবন গ্রহণের মাধ্যমে সমাজের আর ১০টা অপরাধীর অপরাধপ্রবণতাকে সহজাত প্রক্রিয়ায় নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়। ফলে তা যেন আর ১০ জন ব্যক্তির জীবনকে অবচেতনভাবেই রক্ষা করে। এ জন্য সভা-সেমিনার, মিছিল-মিটিং, পুলিশ-র‍্যাব কোনকিছুরই প্রয়োজন হয় না। মানুষ নিজ থেকেই সমাজকে রক্ষার কাজে নিয়োজিত হয়ে যায়। এখানেই তো আল্লাহর বিধানের সৌন্দর্য ও যৌক্তিকতা।

সঊদী আরবের যত দোষই থাকুক না কেন, অন্ততঃ ইসলামী বিচারব্যবস্থাকে যে তারা মূলসূত্র হিসাবে ধরে রেখেছে এজন্য তারা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। হ্যা, এ আইন বাস্তবায়নে অনেকসময় শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়েছে বটে; যেমনটি ২০০৫ সালে এক বৃটিশ নাগরিকের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। তবে যতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে তাতেই সঊদী আরবের আইন-শৃংখলা অন্যান্য বহু দেশের তুলনায় যে অনেক গুণ উন্নত– নিতান্ত জ্ঞানপাপীও তা অস্বীকার করবে না। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাজনৈতিক হানাহানিতে খুন, নারী নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, ইভটিজিং- ইত্যাকার সামাজিক অপরাধের যেসব কাহিনী প্রতিদিন এ দেশের পত্র-পত্রিকাজুড়ে ভরে থাকে, সে দেশে তা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। ফলে সে দেশে কারাবন্দীর সংখ্যা আমেরিকার চেয়ে ৭০ গুণ কম, যার মধ্যে আবার অর্ধেকের বেশীই বিদেশী।

পরিশেষে বলা যায়, বৃটিশ আইন দ্বারা পরিচালিত বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা আর ইসলামী আইনে পরিচালিত সঊদী বিচারব্যবস্থার মধ্যে যদি তুলনা করা হয়, তবে আকাশ-পাতাল তফাৎটা বোঝার জন্য কোন পরিসংখ্যানের প্রয়োজন হয় না। এ দেশের বৃটিশ প্রবর্তিত বিচারব্যবস্থা যে ন্যায় প্রতিষ্ঠার চেয়ে যে অপরাধীদের রক্ষক হিসাবেই অধিক ব্যবহৃত হচ্ছে তা একেবারে ওপেন সিক্রেট। সম্প্রতি বাংলাদেশের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আকবর আলী খান বিচারব্যবস্থার এই নাজুক বাস্তবতা উল্লেখ করতে যেয়ে আক্ষেপ করে বলেন যে, 'বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা একটি জুয়ার আড্ডায় পরিণত হয়েছে'। যে দেশের বিচারব্যবস্থার এই নোংরা হাল-হাকিকত উপলব্ধির পরও যাদের কণ্ঠস্বর নীরব থাকে, তাদের মুখে সঊদী বিচারব্যবস্থাকে মধ্যযুগীয় বর্বরতা আখ্যা দিয়ে বাগাড়ম্বর নিতান্তই হাস্যকর শোনায়। বরং চূড়ান্ত সত্য কথা হল, প্রকৃতঅর্থে আইনের শাসন চাইলে এবং বৈষম্যহীন, সুস্থ ও সুশৃংখল সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইলে, এই বিচারব্যবস্থা তথা ইসলামী আইনই হল একমাত্র সমাধান।

কেননা ইসলামী শাসনব্যবস্থাই হল প্রকৃত শাসনব্যবস্থা। ইসলামী আইনই হল প্রকৃত আইন। এ বিধান স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছেন। এ বিধান মানুষের জন্য যে সকল নীতিমালা আবশ্যকীয় করে দিয়েছে তা সকলের জন্য সমানভাবে কল্যাণকর ও তাদের স্বাভাবিক চাহিদার অনুকূল। এ ব্যবস্থা সর্বকালের সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য ও মানব সমাজের শৃংখলাবিধানের সর্বাধিক উপযোগী বিধান। আপাত দৃষ্টিতে তা যত কঠোরই মনে হোক না কেন, তার অভ্যন্তরে মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক দাবী এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির যে সুসমন্বয় ঘটেছে তার কোন বিকল্প নেই। তাই সমাজে প্রকৃত অর্থে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চাইলে এবং রাষ্ট্র পরিচালনাযন্ত্র ন্যায়বিচারপূর্ণ কাঠামোয় উত্তীর্ণ করতে চাইলে এই বিচারব্যবস্থাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে সমাজে। কেবল সামাজিক নিরাপত্তার স্বার্থেই নয় বরং মুসলিম হিসাবে ঈমান রক্ষার স্বার্থেও আমাদেরকে এ বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। আমীন!!

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪১): কোন ব্যক্তি ঋণ রেখে মারা গেলে তার ওয়ারিছগণ যদি তা পরিশোধ না করে, তাহ'লে মৃত ব্যক্তি কি দায়ী হবে? না ওয়ারিছগণ অপরাধী সাব্যস্ত হবে?

-মাসঊদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : প্রত্যেক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য উচিত মৃত্যু আসার পূর্বে ঋণ পরিশোধ করা এবং উপায় না থাকলে ওয়ারিছগণকে সে ব্যাপারে অছিয়ত করে যাওয়া। অন্যথায় তার আত্মা ঝুলন্ত থাকবে। এসব ব্যক্তির জানাযার ছালাত রাসূল (ছাঃ) পড়াননি *(আহমাদ, তিরমিযী, বুলূগুল মারাম হা/৫২৯)*। ঋণের ব্যাপারে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে যায় তাহ'লে সে দায়ী থাকবে। পক্ষান্তরে ওয়ারিছগণ যদি তার ঋণ পরিশোধ না করে তাহ'লে তারা অপরাধী হবে। মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ দিয়ে নিম্নোক্ত কাজ করতে হবে।

(ক) তার মাল থেকে সর্বপ্রথমে দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। (খ) এরপর ঋণ পরিশোধ করতে হবে (গ) অছিয়ত পুরা করতে হবে। তবে অছিয়ত যেন $^{১}/_{৩}$ অংশ সম্পদের বেশী না হয় (ঘ) অতঃপর অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিছগণের মধ্যে তাদের অংশ মোতাবেক বণ্টন হবে।

প্রশ্ন (২/৪২) : কাউকে ছিয়াম পালনের পরিবর্তে ফিদইয়া দেওয়া হ'লে ২০টি ছিয়াম পালনের পরে যদি সে ইন্তেকাল করে, তবে বাকী ১০টি ছিয়ামের জন্য কি পুনরায় ফিদইয়া দিতে হবে?

-জাদীদা
গোবিন্দা, পাবনা।

উত্তর : জীবিত ব্যক্তির ওপর শরী'আতের বিধি-বিধান প্রযোজ্য, মৃত ব্যক্তির ওপর নয়। অতএব তার পক্ষ থেকে কোন ছিয়ামও পালন করা লাগবে না এবং ফিদইয়াও প্রদান করতে হবে না। তবে তার অছিয়ত বা মানত থাকলে তার বদলে ছিয়াম অথবা ফিদইয়া দেওয়া যাবে *(আলবানী, তালখীছ আহকামিল জানায়েয, পৃঃ ৭৫; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২০৫)*।

প্রশ্ন (৩/৪৩) : হজ্জ বা ওমরা করতে গিয়ে এক ব্যক্তি একাধিক ওমরা করতে পারবে কি? যেমন ওমরা করে মদীনায় গেল। ফিরে এসে আবার ওমরা করল এমনটি করতে পারবে কি? কিংবা একই ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যক্তির নামে ওমরা ও ত্বওয়াফ করতে পারে কি?

-গোলাম মুক্তাদির
বি.কে. রায় রোড, খুলনা।

উত্তর : এ বিষয়ে সঊদী আরবের সাবেক প্রধান মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) বলেন, 'কিছু সংখ্যক লোক হজ্জের পর অধিক সংখ্যক উমরাহ করার আগ্রহে 'তানঈম' বা জি'ইর্রানাহ নামক স্থানে গিয়ে ইহরাম বেঁধে আসেন। শরী'আতে এর কোনই প্রমাণ নেই' *(দলীলুল হাজ্জ ওয়াল মু'তামির, অনুঃ আব্দুল মতীন সালাফী, 'সংক্ষিপ্ত নির্দেশাবলী' অনুচ্ছেদ, মাসআলা-২৪, পৃঃ ৬৫)*। সঊদী আরবের সাবেক ২য় মুফতী শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, এটি জায়েয নয়। বরং বিদ'আত। কেননা এর পক্ষে একমাত্র দলীল হ'ল বিদায় হজ্জের সময় আয়েশা (রাঃ)-এর ওমরাহ। অথচ ঋতু এসে যাওয়ায় প্রথমে হজ্জে ক্বিরান-এর ওমরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় হজ্জের পরে তিনি এটা করেছিলেন। তার সাথে 'তানঈম' গিয়েছিলেন তার ভাই আব্দুর রহমান। কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি পুনরায় ওমরাহ করেননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথী অন্য কোন ছাহাবীও এটা করেননি' *(ঐ, মাজমূ' ফাতাওয়া, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১৫৯৩; ঐ, লিক্বা-উল বাব আল-মাফতূহ, অনুচ্ছেদ ১২১, মাসআলা ২৮)*। শায়খ আলবানীও একে নাজায়েয বলেছেন এবং একে 'ঋতুবতীর ওমরাহ' (عمـــرة الحـــائض) বলেছেন *(ছহীহাহ হা/১৯৮৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িমও একে নাজায়েয বলেছেন *(যাদুল মা'আদ ২/৮৯)*।

প্রশ্ন (৪/৪৪) : লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্যটি বললে শিরক হবে কি? মসজিদের মেহরাবের উপর উক্ত বাক্যসহ এক পার্শ্বে আল্লাহ অপর পার্শ্বে মুহাম্মাদ লিখা যাবে কি? এর কোন উপকারিতা আছে কি? কালেমা তাইয়েবাহ কোনটি?

-ডাঃ এনামুল হক
পলিখাপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : উক্ত বাক্য বললে শিরক হবে না। বাক্যটি কালেমায়ে শাহাদাতের প্রচলিত মূল অংশ। তবে উক্ত বাক্যসহ আল্লাহ, মুহাম্মাদ শব্দ মসজিদের মেহরাবের উপর লেখা যাবে না। এছাড়া কোন আয়াত ও দো'আও লেখা ঠিক নয়। এগুলো বাড়াবাড়ি মাত্র। আল্লাহ মুহাম্মাদ লিখলে অর্থ ভুল হয়, যা বড় শিরক হয়ে যায়। কেননা তখন এর অর্থ হবে যিনি আল্লাহ তিনি মুহাম্মাদ বা যিনি মুহাম্মাদ তিনিই আল্লাহ।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কালেমা ত্বাইয়েবা হ'ল 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' *(তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা ইবরহীম ২৪ আয়াত)*।

প্রশ্ন (৫/৪৫) : মহিলারা ছালাত আদায় করার সময় পিঠ, পেট ও মাথার চুল খোলা রাখলে তাদের ছালাত হবে কি?

-আমীরুল ইসলাম

মণিপুর, গাযীপুর।

উত্তর : ছালাত আদায়ের সময় উক্ত অঙ্গগুলো খোলা রাখলে তাদের ছালাত শুদ্ধ হবে না *(আবূদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/২০৭)*। কেননা 'মহিলাদের সর্বাঙ্গ সতরের অন্তর্ভুক্ত, চেহারা ও দুই হস্ততালু ব্যতীত' *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৩৮)*।

প্রশ্ন (৬/৪৬) : তাস, দাবা, কেরাম বোর্ড, লুডু খেলা শরী'আতের দৃষ্টিতে কেমন অপরাধ? এর শাস্তি কি?

-মাষ্টার সিরাজুল ইসলাম
হাটগাঙ্গোপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : খেলা-ধুলা মানুষের জন্মগত স্বভাব। এর উদ্দেশ্য সাময়িক শরীর চর্চা। যা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। বয়স ভেদে মানুষের শরীর চর্চার ধরনের পরিবর্তন হয়। কিন্তু সাময়িক শরীর চর্চার বদলে যদি তা কেবল সময়ের অপচয় হয়, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়, যদি ঐ ব্যক্তি দ্বীন থেকে গাফেল হয়, দায়িত্ব বিস্মৃত হয় বা তাতে জুয়া মিশ্রিত হয়, তখন ঐ খেলা হারামে পরিণত হয়। একদিন দু'জন আনছার ছাহাবী তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা করছিলেন। হঠাৎ একজন বসে পড়লেন। তখন অপরজন বিস্মিত হয়ে বললেন, কি ব্যাপার। কষ্ট হয়ে গেল নাকি? জবাবে তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক বস্তু যা আল্লাহ্র স্মরণকে ভুলিয়ে দেয়, সেটাই অনর্থক (لَهْــو) ... *(নাসাঈ, ছহীহাহ হা/৩১৫)*। এতে বুঝা যায় যে, বৈধ খেলাও যদি আল্লাহ্র স্মরণকে ভুলিয়ে দেয়, তবে সেটাও জায়েয হবে না। ইমাম বুখারী (রহঃ) অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, 'প্রত্যেক খেলা-ধুলা (لَهْو) বাতিল, যদি তা আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে উদাসীন করে দেয়' *(ফাৎহুলবারী 'অনুমতি গ্রহণ' অধ্যায় ৭৯, অনুচ্ছেদ ৫২; ১১/৯৪ পৃঃ)*। আল্লাহ বলেন, লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা অজ্ঞতাবশে বাজে কথা খরিদ করে মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুৎ করার জন্য এবং সত্য পথকে তারা বিদ্রুপ করে, তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি'। 'যখন তার নিকট আমাদের আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে এটা শুনতেই পায়নি। যেন তার দুই কানে বধিরতা আছে। অতএব তুমি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও' *(লোকমান ৬-৭)*।

প্রশ্নে বর্ণিত খেলাসমূহে উপরে বর্ণিত ক্ষতিকর বিষয়সমূহ থাকায় তা অবশ্যই 'বাতিল' বলে গণ্য হবে। তাদেরকে উপদেশের মাধ্যমে ফেরাতে হবে। নইলে পিতা-মাতা, অভিভাবক বা সমাজ নেতাগণ অনুশাসন মূলক শাস্তি দিবেন। শারঈ দণ্ড যা এক্ষেত্রে ১০ বেত্রাঘাতের উপরে নয়, তা কেবল সরকারী আদালত দিতে পারে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৬৫)*।

প্রশ্ন (৭/৪৭) : কত মাইল অতিক্রম করার পর ছালাত ক্বছর করা যাবে? প্রচলিত আছে ৪৮ মাইল অতিক্রম করার পর ক্বছর করতে হবে। উক্ত দাবী কি সঠিক? কতদিন পর্যন্ত ছালাত ক্বছর ও জমা করা যাবে।

-সানোয়ার
জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : মাইল ও দিন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং সফরের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হওয়ার পর থেকে ছালাত জমা ও ক্বছর করা যাবে। যতদিন পুনরায় বাড়ীতে ফিরে না আসবে। রাসূল (ছাঃ) সফরে বের হওয়ার পর থেকে ফেরা পর্যন্ত ছালাত ক্বছর ও জমা করতেন *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৫৯)*।

প্রশ্ন (৮/৪৮) : প্রচলিত আছে আসমানী কিতাব ১০৪ খানা। কোন নবীর উপর কতখানা কিতাব নাযিল হয়েছিল?

-ইবরাহীম
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : প্রসিদ্ধ কিতাব ৪ খানা। তওরাত, যবূর, ইনজীল ও কুরআন। এছাড়া ইবরাহীম (আঃ) ও অন্যান্য কতিপয় নবীর উপরও ছহীফাহসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে *(আ'লা ১৯)*। কিন্তু সেগুলির বিষয়ে কিছু জানা যায় না।

প্রশ্নঃ (৯/৪৯) : কোন ব্যক্তি যদি ভুলক্রমে ছালাতের প্রথম বৈঠকে আত্তাহিইয়াতুর সাথে দরূদ ও দো'আ মাছূরাহ পড়ে নেয়, তাহ'লে ছালাত শেষে তাকে সহো সিজদা দিতে হবে কি?

-আবু তাহের
পশ্চিম গাটিয়াডাঙ্গা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : কারণ এগুলি ওয়াজিব তরক হওয়ার বিষয় নয় *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১২৮)*।

প্রশ্নঃ (১০/৫০) : জনৈক আলেম বলেন, মুতার যুদ্ধে আবুবকর (রাঃ) তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করার কারণে তার স্ত্রী খেজুর পাতার পোষাক পরেছিলেন। তার সম্মানে আসমান যমীনের সমস্ত ফেরেশতা খেজুর পাতার পোষাক পরেছিলেন। উক্ত ঘটনা কি সত্য?

-সবুজ
নাছিরাবাদ, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত ঘটনা ভিত্তিহীন, বানোয়াট।

প্রশ্ন (১১/৫১) : আছর ছালাতের পর আর কোন ছালাত নেই। কিন্তু তাহিইয়াতুল মাসজিদ, তাহিইয়াতুল ওযূ ও ছালাতুল হাজত পড়া যাবে কি? রাসূল (ছাঃ) ও কোন ছাহাবী পড়েছেন কি?

-নূরুদ্দীন
নরসিংদী।

উত্তর : আছর ছালাতের পর কারণ বিশিষ্ট ছালাত সমূহ পড়া যায়। যেমন জানাযা, সূর্য গ্রহণের ছালাত, তাহিইয়াতুল ওযূ, তাহিইয়াতুল মাসজিদসহ যেকোন কারণ বিশিষ্ট ছালাত *(ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৪৫)*।

প্রশ্ন (১২/৫২) : জনৈক আলেম বলেন, আরসি, কোকাকোলা, সেভেনআপ ইত্যাদি পানীয় হারাম। কারণ এগুলো মদ জাতীয় বস্তু। কিন্তু এর নামকরণ হয়েছে ভিন্ন। উক্ত বক্তব্য কি ঠিক?

-ডাঃ বযলুর রহমান
যশোর।

উত্তর : উক্ত পানীয়গুলোর মধ্যে যদি কোন হারাম বস্তু মিশ্রিত থাকে তাহ'লে তা হারাম, নইলে নয়। মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, যে বস্তুর বেশীতে মাদকতা আসে, তার অল্পটাও হারাম *(আবূদাউদ হা/৩৬৮২)*।

প্রশ্ন (১৩/৫৩) : ঈদের ছালাতের পর মুছল্লীরা ইমামের সাথে মুছাফাহা করে ও ইমামকে টাকা দেয়। উক্ত টাকা ইমাম গ্রহণ করতে পারেন কি? ঈদের ছালাতের জন্য ইমামকে পাথেয় বা সম্মানী দেওয়া যাবে কি?

-মুবারক
হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত কাজ শরী'আত সম্মত নয়। ইমামকে সম্মানী দেওয়া যাবে। তবে তাকে দেওয়ার জন্য অর্থ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে। তাছাড়া ঈদগাহের উন্নয়ন ও ইসলামী দাওয়াতী কাজে সহযোগিতা করার জন্য দান করবে।

প্রশ্ন (১৪/৫৪) : শায়খ উছায়মীন বলেন, ইক্বামতের জবাব না দেওয়াই ভাল। অন্যদিকে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)-এ বলা হয়েছে, ইক্বামতের জবাব দিতে হবে। কোনটি সঠিক?

-আতাউর রহমান
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : হাদীছে আযান ও ইক্বামত উভয়কে আযান বলা হয়েছে। সেকারণ মুওয়াযযিন যা বলবে, মুক্তাদীও তাই বলবে। অতএব 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'-এর বক্তব্য সঠিক।

প্রশ্ন (১৫/৫৫) : জনৈক আলেম বলেন, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' একবার বলবে, তার ৪ হাযার পাপ মাফ হয়ে যাবে। যতবার বলবে ততবার ৪ হাযার পাপ মাফ হয়ে যাবে। তার পাপ না থাকলে তার স্ত্রীর, তারপর তার মেয়ের পাপ মাফ হবে। উক্ত কথা কি সঠিক?

-রফীকুল ইসলাম
কসবা, গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তর : উক্ত মর্মে ছহীহ কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (১৬/৫৬) : কোন্ মহিলা জান্নাতে মহিলাদের সরদার হবেন? ফাতেমা, না মারইয়াম (আঃ)? জান্নাতে কোন্ কোন্ মহিলা সর্বাধিক সম্মানিতা হবেন?

-আশরাফ মণ্ডল
মর্জুনপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বিশ্বের মধ্যে চারজন নারী শ্রেষ্ঠ- মারইয়াম বিনতে ইমরান, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ ও ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া *(তিরমিযী হা/৩৮৭৮; ঐ, মিশকাত হা/৬১৮১)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, উক্ত চারজন হ'লেন জান্নাতী মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (أفضل نساء أهل الجنة) *(আহমাদ হা/২৬৬৮)*। অতএব সবাই সমান সম্মানিত। তবে এঁদের মধ্যে সরদার হবেন ফাতেমা (রাঃ) *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬১২৯; আলোচনা দ্রষ্টব্য: তুহফাতুল আহওয়াযী হা/৩৮৯৩)*।

প্রশ্ন (১৭/৫৭) : মসজিদের জমি কবরস্থানের জমির সাথে বদল করা যাবে কি? যেমন রাস্তার পার্শ্বে কবরস্থান আর মাঠে মসজিদের জমি আছে। এক্ষণে কবরস্থানের কিছু জমির সাথে মসজিদের জমি বদল করে কবরস্থানের জমিতে মসজিদ করা যাবে কি?

-হাসীনুর রহমান
নাটোর।

উত্তর : কবরস্থানের জমি মসজিদ বানানোর জন্য নেয়া ঠিক নয়। এছাড়া মসজিদ সম্প্রসারণের প্রয়োজন পড়লে সমস্যা হ'তে পারে। আবার কবর কেন্দ্রিক বিদ'আতও চালু হয়ে যেতে পারে। অতএব কবরস্থানের জমি মসজিদ বানানোর জন্য বদল করে নেয়া যাবে না।

প্রশ্ন (১৮/৫৮) : আমার পিতা বৃদ্ধ মানুষ। সর্বদা অসৎ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে এবং প্রচুর অর্থ নষ্ট করে। আমরা তাকে সৎ পথে ফিরে আসার কথা বললেই বিভিন্নভাবে অভিশাপ দেয়। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কী?

-আশরাফুল ইসলাম
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : অসৎ কাজ করতে থাকলে সর্বদা নছীহত করতে হবে এবং তার হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করতে হবে। তবে নরম ভাষায় তাকে উপদেশ দিতে হবে। কারণ আল্লাহ্ হেদায়াত না করলে যবরদস্তি করে কাউকে হেদায়াত করা সম্ভব নয় *(বাক্বারাহ ২৭২; ক্বাছাছ ৫৬)*। এছাড়া তার সাথে সদাচরণ করতে হবে। কোন প্রকার মর্যাদাহানিকর ব্যবহার করা যাবে না *(ইসরা ৩৩)*।

প্রশ্ন (১৯/৫৯) : আরাফায় অবস্থানকালে জাবালে রহমত দর্শন করে দো'আ করার সময় পাহাড়কে ক্বিবলা করা যাবে কি? দম দেওয়ার অর্থ কি?

-সৈয়দ ফায়েয
ধামতী, কুমিল্লা।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আরাফার ময়দানের সকল স্থানই হাজীগণের অবস্থানস্থল *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৯৩)*। অতএব আরাফার যেকোন স্থান হ'তে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ করতে হবে। এক্ষেত্রে জাবালে রহমতকে ক্বিবলার দিকে রাখা শর্ত নয় এবং তা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

দম অর্থ- হজ্জের কোন ওয়াজিব তরক করলে কাফফারা স্বরূপ

একটি পশু কুরবানী করা।

প্রশ্ন (২০/৬০) : 'বিসমিল্লায় গলদ' একটি পরিভাষা সমাজে চালু আছে। একথা বলা যাবে কি?

-হোসনে আরা আফরোয
শেরপুর, বগুড়া।

উত্তর : এটি বাংলা ভাষার একটি বাগধারা। এটা বলা যাবে না। এটা উক্ত পবিত্র বাক্য নিয়ে ব্যঙ্গ করার শামিল। তবে এর পরিবর্তে গোড়ায় গলদ বা শুরুতেই ভুল এমনটি বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন (২১/৬১) : ছালাতরত অবস্থায় মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নাম শুনলে (ছাঃ) বলতে হবে কি?

-আযীযুর রহমান
রামনগর, নাটোর।

উত্তর : না। কেননা রাসূল (ছাঃ) কিংবা ছাহাবীদের থেকে এরূপ বলার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ছালাতের বাইরে শুনলে পড়তে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯২১)*।

প্রশ্ন (২২/৬২) : কবরস্থানে ছালাত আদায় করা যায় না। কিন্তু হজ্জ করতে গিয়ে দেখলাম মসজিদে নববীতে রাসূল (ছাঃ)-এর কবর রয়েছে এবং তা পাকা করা আছে। এর ব্যাখ্যা কী?

-আতিয়ার রহমান
বাগআঁচড়া, শার্শা, যশোর।

উত্তর : প্রথমতঃ কবরের উপর মসজিদ বানানো হয়নি। দ্বিতীয়তঃ রাসূল (ছাঃ)-কে মসজিদে কবর দেয়া হয়নি। তাঁকে আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে দাফন করা হয়েছিল *(ছহীহ তিরমিযী হা/১০১৮)*। তৃতীয়তঃ মসজিদে নববীতে কবরস্থান নেই। রাসূল (ছাঃ)-এর কবর পাকা করাও নেই। বুঝতে এবং দেখতে ভুল হয়েছে। যেখানে পাকা করা আছে সেটা ঘরের দেয়াল। মূলতঃ আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরকে মসজিদের মধ্যে নেওয়া হয়েছে। তবে এটা চার খলীফার যুগে করা হয়নি; বরং ৯৪ হিজরীর দিকে করা হয়েছে। সে সময় মাত্র কয়েকজন ছাহাবী বেঁচে ছিলেন। তাঁদের পক্ষ থেকে বিরোধিতাও করা হয়েছিল। এমনকি বিশিষ্ট তাবেঈ সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়িবও বিরোধিতা করেন। চতুর্থতঃ উক্ত ঘরকে মসজিদ বানানো হয়নি। বরং এই ঘরকে তিনটি দেয়ালের দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়েছে। যেগুলোর একটি দেয়ালকে ত্রিকোণ রূপে বানিয়ে দু'টি কোন কিবলার (দক্ষিণের) দিকে আর একটি কোণকে উত্তরের দিকে করে দেয়া হয়েছে। যাতে করে উত্তর দিকে ছালাত আদায়কারীদের চেহারা সরাসরি কবরমুখী না হয়।

এর দ্বারা কবরপূজার পক্ষে দলীল দেওয়া যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) ও চার খলীফার যুগের পরে এটা করা হয়েছে, ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালেকের যুগে ৯৪ হিজরীর দিকে *(শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ ওছাইমীন, আল-কাওলুল মুফীদ 'আলা কিতাবিত তাওহীদ ১/৩৯৮; মাজমূ' ফাতাওয়া ২/১৮০-১৮১ ও ৯/৩২১)*।

প্রশ্ন (২৩/৬৩) : জিনদের কেউ মারা গেলে তারাও কি মানুষের মত কবর দেয়? তারা কোথায় বাস করে? তারা কি তাদের রূপ পরিবর্তন করতে পারে?

-আতিয়ার রহমান
শার্শা, যশোর।

উত্তর : কিভাবে তারা জন্ম গ্রহণ করে, কিভাবে মৃত্যু বরণ করে, কি কর্ম করে, কি ধরনের পোষাক পরে এগুলো সম্পর্কে কোন তথ্যই কুরআন-হাদীছে পাওয়া যায় না। তবে যেহেতু রাসূল (ছাঃ)-কে জিন জাতির জন্যও প্রেরণ করা হয়েছে। অতএব তারাও কবর দেয়ার ইসলামী রীতি অবশ্যই মেনে চলতে বাধ্য। তবে তার ধরণ মানুষের অজানা। জিনদেরকেও ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে *(যারিয়াত ৫৬)*। ক্বিয়ামতের দিন তারা জিজ্ঞাসিত হবে *(আন'আম ১৩০)*। জিনরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট দ্বীন শেখার জন্য এসেছিল *(জিন ১; আহকাফ ২৯)*। তাদের মধ্য থেকে অনেকে ইসলামও গ্রহণ করেছে *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৫২৫৭)*। রাসূল (ছাঃ)ও তাদের নিকট ইসলাম প্রচারের জন্য গিয়েছেন *(ছহীহ তিরমিযী হা/৩২৫৮)*। অতএব শরী'আতের বিধান তাদের জন্যও প্রযোজ্য। জিনেরা মরুভূমি, গর্ত, মানুষের বসতবাড়ী সহ বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করে। কিছু জিন ময়লা-আবর্জনাযুক্ত স্থানে, টয়লেটে, কবরস্থানে থাকে। এরা বিভিন্ন রূপ ধারণ এবং রূপ পরিবর্তন করতে পারে *(বুখারী হা/২৩১১; আবুদাউদ হা/৫২৫৭; মিশকাত হা/৪১১৮; মিশকাত হা/৪১৪৮)*।

প্রশ্ন (২৪/৬৪) : মসজিদের উপর ইয়াতীমখানা ও মাদরাসার জন্য ২য় তলা করা যাবে কি এবং সেখানে যাকাতের টাকা লাগানো যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাবীবুর রহমান
কাহারোল, দিনাজপুর।

উত্তর : মসজিদের উপর ইয়াতীমখানা ও মাদ্রাসা তৈরি করা যাবে। তবে মাদ্রাসা এবং ইয়াতীমখানার জন্য যেমন যাকাতের টাকা ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু মসজিদের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা বৈধ নয়। অতএব উভয়ের ফাণ্ড পৃথক রাখতে হবে।

প্রশ্ন (২৫/৬৫) : জনৈক বক্তা বলেন, 'আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি' একথা বলা যাবে না। কারণ শুধু ছহীহ হাদীছ দ্বারা মুসলিমগণ জীবন ধারণ করতে পারবে না। যেমন ফজরের আযানে 'আছ ছালাতু খায়রুম মিনান্নাউম' বলার হাদীছ যঈফ। উক্ত দাবী কি সঠিক?

-নযরুল ইসলাম
কোলগ্রাম, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তর : উক্ত দাবী সঠিক নয়। মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকেই আহ্বান করতে হবে এবং এর মাধ্যমেই যাবতীয় সমাধান সম্ভব। 'আছছালাতু খায়রুম মিনান্নাউম' বলার হাদীছটি ছহীহ। শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছকে ছহীহ বলেছেন *(আবুদাউদ হা/৫০০, ৫০১, ৫০৪;*

নাসাঈ হা/৬৩৩, ৬৪৭; ইবনু মাজাহ হা/৭১৬; মিশকাত হা/৬৪৫)। তবে তিরমিযী ও ইবনু মাজাহতে হাদীছটি যে সনদে বর্ণিত হয়েছে, সেটি যঈফ *(তিরমিযী হা/১৯৮; ইবনু মাজাহ হা/৭০৭)*।

প্রশ্ন (২৬/৬৬) : ছালাতের কাতার ঠিক করে নেওয়ার দায়িত্ব কার? যদি এই দায়িত্ব ইমামের হয়, তাহ'লে তিনি না করলে কতটুকু দায়ী হবেন? কারণ মুক্তাদীরা কাতার সোজা করার প্রতি কোন গুরুত্ব দেয় না।

-ইসলামুল হক
কামার কুড়ি, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : এ দায়িত্ব ইমামের। ইমাম বলার পরেও যদি মুছল্লীরা কাতার সোজা না করে তাহ'লে মুক্তাদীরাই দায়ী হবে। রাসূল (ছাঃ) কাতার সোজা করার নির্দেশ প্রদান করতেন, এমনকি কাঁধ ধরেও সোজা করে দিতেন *(নাসাঈ হা/৮১২, ৮১৩; তিরমিযী হা/২২৭)*।

প্রশ্ন (২৭/৬৭) : বাংলাদেশ সরকারের আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের নীচে কন্যা সন্তানের এবং ২১ বছরের নীচে ছেলেদের বিবাহ দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অপর দিকে ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে ছেলে-মেয়ে বালেগ হ'লেই বিবাহ দেওয়া যাবে। এমতাবস্থায় করণীয় কি?

-সৈয়দ আশরাফ
পাথরঘাটা, ঝাউডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সরকারের উক্ত আইন শরী'আত পরিপন্থী। অভিভাবক তার সুবিধা অনুযায়ী মেয়ের বিবাহ দিতে পারে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে ৬/৭ বছর বয়সে বিবাহ করেছিলেন এবং নয় বছর বয়সে সংসার শুরু করেছিলেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৯৩৩)*। উল্লেখ্য যে, সরকারের শরী'আত সম্মত নির্দেশ অবশ্যই পালন করতে হবে *(নিসা ৫৯)*।

প্রশ্ন (২৮/৬৮) : আমি একজন পল্লী চিকিৎসক। আমার মাধ্যমে কোন রোগী কোন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নীত হ'লে উক্ত সেন্টারের পক্ষ থেকে আমাকে কিছু কমিশন দেওয়া হয়। তবে এজন্য রোগীর নিকট থেকে অতিরিক্ত চার্জ নেওয়া হয় না। অন্যান্য রোগীর মতই নেওয়া হয়। উক্ত কমিশন নেওয়া কি বৈধ?

-আব্দুল্লাহ
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : যদি রোগীর নিকট হ'তে অতিরিক্ত অর্থ নেয়া না হয় এবং এ কারণে রোগীর কোন ক্ষতি না হয়, তাহ'লে পারিশ্রমিক হিসাবে কমিশন নেওয়া যেতে পারে। তবে কোন প্রকার ধোঁকার আশ্রয় নেয়া হ'লে পারিশ্রমিক হারাম হবে *(মুসলিম হা/২৯৪; মিশকাত হা/৩৫২০)*।

প্রশ্ন (২৯/৬৯) : মৃত মাতা-পিতার জন্য কোন্ কোন্ দো'আ পড়ে ক্ষমা চাইতে হবে? দো'আগুলো বাংলা উচ্চারণসহ জানতে চাই। উক্ত দো'আগুলো ছালাতের মধ্যে ও ছালাতের বাইরে হাত তুলে করা যাবে কি?

-আফতাবুর রহমান
মনিপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : নিম্নের আয়াত পাঠ করবে- رَبَّنَا اغْفِرْ لِـــيْ وَلِوَالِـــدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَـــوْمَ يَقُـــوْمُ الْحِـــسَابُ 'রব্বানাগফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়া লিলমু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকূমুল হিসাব' *(ইবরাহীম ৪১)*। অনুরূপভাবে নিম্নের আয়াতাংশও পড়া যাবে- رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَـــا رَبَّيَـــانِىْ صَـــغِيْراً 'রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী ছাগীরা' *(বণী ইসরাঈল ২৪)*। এছাড়া মৃত পিতা-মাতার জন্য জানাযায় পঠিত 'আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়ার হামহু..' এবং 'আল্লাহুম্মাগ ফির লি হাইয়িনা ...' দো'আগুলোও পড়া যাবে। ছালাতের মধ্যে তাশাহহুদ ও দরূদ পড়ার পর সালামের পূর্বে উক্ত দো'আগুলো পাঠ করা যাবে। আর ছালাতের বাইরে অন্য সময়ে একাকী হাত তুলে উক্ত দো'আগুলো সহ নিজ ভাষাতেও পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা চেয়ে দো'আ করা যাবে। উল্লেখ্য, দো'আ শেষে হাত দ্বারা মুখ মাসাহ না করে ছেড়ে দিবেন।

প্রশ্ন (৩০/৭০) : মক্কার বাসিন্দারা হজ্জ করার সময় আরাফা ও মুযদালিফায় ছালাত ক্বছর ও জমা করেন। অথচ তারা মুসাফির নন। ইমামও তাই করেন। তিনিও মক্কার বাসিন্দা। অথচ বাংলাদেশের হাজীগণ সেখানে গিয়ে ক্বছরও করেন না, জমাও করেন না। এর কারণ কি?

-আব্দুল মজীদ
খুলনা।

উত্তর : বাংলাদেশী হাজীরা ক্বছর ও জমা না করে ভুল করেন। অথচ সফর অবস্থায় ছালাত ক্বছর ও জমা করাই সুন্নাত। তারা অবজ্ঞা করে সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করেন *(আবুদাঊদ হা/১৯২৬; ছহীহ নাসাঈ হা/১৪৩৩; তিরমিযী হা/৫৫৩)*। তবে মুক্বীম ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করলে পূর্ণ ছালাত আদায় করবে *(ইরওয়াউল গালীল হা/৫৭১)*। আর মক্কার বাসিন্দারা যখন মিনার উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন তারা হজ্জের সফরের নিয়তে বের হয়। তাই তারাও মুসাফির হিসাবে মিনা, আরাফা ও মুযদালিফায় ক্বছর করে *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৯৬৫)*।

প্রশ্ন (৩১/৭১) : তামাত্তু হজ্জ করলে বদলী হজ্জ আদায় হবে কি? জনৈক মুফতী বলেন, উক্ত হজ্জ হবে না। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল আলীম
মণিরামপুর, যশোর।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। পূর্বে হজ্জ করা থাকলে যে কোন ব্যক্তি অন্যের জন্য বদলী হজ্জ করতে পারবেন, তিনি প্রকার হজ্জের যেটিই হোক না কেন *(আবুদাঊদ হা/১৮১১)*।

প্রশ্ন (৩২/৭২) : কোথাও কোথাও পীরের মাযার ও মসজিদ একই সাথে। কোন কোন মসজিদের চারপাশে কবর রয়েছে। উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?

-মুনীরুল ইসলাম।
সাতক্ষীরা।

উত্তর : মাযার কেন্দ্রিক কোন মসজিদেই ছালাত আদায় করা যাবে না। অনুরূপ মসজিদের জমিতে কবর হ'লে সেখানেও ছালাত হবে না। সুতরাং মাযার বা কবর আগের হ'লে সেখান থেকে মাসজিদ দূরে সরাতে হবে। আর মসজিদ আগে থেকে নির্মিত হয়ে থাকলে, কবর স্থানান্তর করতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) কবরস্থানে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৩১৪, সনদ ছহীহ)*। শায়খ আলবানী বলেন, وسواء في ذلك أكان القبر قبلته أو عن يمينه أو عن يساره أو خلفه *(আছ-ছামারুল মুস্তাত্বাব, পৃঃ ৩৫৭)*। তবে দেওয়াল দিয়ে কবরস্থান পৃথক করা থাকলে দোষ নেই।

প্রশ্ন (৩৩/৭৩) : ইরি মৌসুমে আমার ধান হয় ২০ বস্তা, যার মূল্য প্রায় ২০ হাযার টাকা। আমার ঋণ আছে ৪০ হাযার টাকা। এক্ষণে ওশর দেওয়া উত্তম, না ঋণ পরিশোধ করা উত্তম?

-ইকরামুল কবীর
বকচরা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : ওশর হচ্ছে ফসলের যাকাত। অতএব ফসল যদি নিছাব পরিমাণ হয়, তাহ'লে ওশর বের করতে হবে। *(আন'আম ১৪১; তিরমিযী হা/৬২৬)*। ওশর আদায় করে বাকী টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা যাবে। তবে উক্ত ধান বা গম উৎপাদন বাবদ যদি ঋণ হয়ে থাকে, তাহ'লে আগে ঋণ পরিশোধ করে নিছাব পরিমাণ থাকলে তার ওশর প্রদান করতে হবে।

প্রশ্ন (৩৪/৭৪) : জাতীয় দিবস হিসাবে আমাদের দেশে যে সমস্ত দিন পালন করা হয়, সেগুলো সমর্থন করা ও সেখানে সহযোগিতা করা, অংশগ্রহণ করা কি শরী'আত সম্মত?

-আনীসুর রহমান
কানাইকাটা, পলাশবাড়ী, নীলফামারী।

উত্তর : ইসলামে এ ধরনের কোন দিবস পালনের বিধান নেই। এগুলো বিজাতীয় রীতি হিসাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু হয়েছে। আর যেগুলো ইসলাম সমর্থন করে না সেগুলোতে অংশগ্রহণ করা ও সহযোগিতা করা যাবে না *(মায়েদাহ ৩)*।

প্রশ্ন (৩৫/৭৫) : জনৈক ইমাম জুম'আর খুৎবায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা রাতে পেশাব করে হাড়িতে রেখে সকালে একজন ছাহাবী আসলে তাকে প্রস্রাবগুলি ফেলে দিতে বললেন। ছাহাবী পেশাবের হাড়িটাকে বাহিরে নিয়ে গিয়ে রাসূলের প্রতি মহব্বতের কারণে তা খেয়ে নেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আসলে তিনি বলেন, কি ফেলে দিয়েছ? তখন ছাহাবী চুপ থাকেন। বারবার জিজ্ঞেস করার পর লোকটি বলেন আমি তা খেয়ে ফেলেছি। ফলে উক্ত ছাহাবী মারা গেলে তার শরীর থেকে সুগন্ধি বের হয়। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আরিফ
পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : ঘটনাটি ত্বাবারাণী ও হিলইয়াতে বর্ণিত হয়েছে *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/২০৭৪০; হিলইয়াতুল আউলিয়া ২/৬৭; হাকেম হা/৬৯১২)*। হাদীছটি যঈফ। কারণ এর সনদে আব্দুল মালেক ইবনু হুসাইন আবূ মালেক নাখঈ নামে একজন নিতান্ত দুর্বল রাবী আছেন। মুহাদ্দিছগণ সকলেই এব্যাপারে একমত। এছাড়া সনদগত আরো অনেক ত্রুটি রয়েছে *(আরশীফু মুলতাকা আহলিল হাদীছ ৪২/২৬৬, ২৬৭; তালখীছুল হাবীর ১/১৭১)*।

প্রশ্ন (৩৬/৭৬) : ইয়াতীমের অর্থ আত্মসাৎ সহ তার উপর যুলুম করলে শাস্তি কি? দরিদ্র লোকদেরকে সহায়তা দানের ফযীলত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সফিউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ গ্রাস করে, নিশ্চয়ই তারা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করে না এবং তারা সত্বর জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(নিসা ১০)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করার জন্য সচেষ্ট ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীর ন্যায় ...' *(বুখারী হা/৬০০৭)*।

প্রশ্ন (৩৭/৭৭) : পৃথিবীর সকল মানুষ কি ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে? দলীল সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক
মহিষালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাতের (ইসলাম) উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বা খৃষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানায়' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯০)*। আর ফিৎরাত অর্থ স্বভাবধর্ম বা ইসলাম।

প্রশ্ন (৩৮/৭৮) : সন্তান প্রসবের পর চল্লিশ দিনের আগে যদি নিফাস বন্ধ হয়, তাহ'লে কি ছালাত, ছিয়াম পালন করতে হবে?

-রহীমা বেগম
চককানু, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : যখনই নিফাস বন্ধ হবে, তখন থেকেই ছালাত আদায় করতে হবে। কারণ নিফাসের সর্বনিম্ন কোন সীমা নেই। আর নিফাসের সর্বোচ্চ সীমা হ'ল চল্লিশ দিন *(আবু দাঊদ হা/৩১১)*।

প্রশ্ন (৩৯/৭৯) : যে সমস্ত পাপী মুমিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে যাবে তারা কি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করবে?

-আব্দুল মজীদ
দক্ষিণ পারাইল, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : যে ব্যক্তি জান্নাতী হবে সেই আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ

করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, তোমরা কি আরো কিছু চাও, যা আমি তোমাদেরকে অতিরিক্ত প্রদান করব? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেননি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? আপনি কি আমাদেরকে মুক্তি দেননি? তখন আল্লাহ তা'আলা পর্দা তুলে ফেলবেন এবং তারা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫৬ 'আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ লাভ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৪০/৮০) : যয়নব, আসমা, উম্মে কুলছূম রাসূল (ছাঃ)-এর কোন স্ত্রীর মেয়ে? ওছমান (রাঃ)-এর সাথে কোন দুই মেয়ের বিবাহ হয়েছিল?

-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
গুজরুক বাকচাড়, বদরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সন্তানাদির মধ্যে ইবরাহীম ছাড়া বাকী ছয় সন্তান খাদীজা (রাঃ)-এর গর্ভে জন্মলাভ করেন। তিন পুত্রের কেউ জীবিত ছিলেন না। তবে চার কন্যার সকলেই জীবিত ছিলেন। তাঁদের নাম হ'ল যথাক্রমে- যয়নব, রোক্বাইয়া, উম্মে কুলছূম এবং ফাতেমা (রাঃ)। প্রশ্নে বর্ণিত 'আসমা' নামে রাসূল (ছাঃ)-এর কোন কন্যা সন্তান ছিল না। ওছমান (রাঃ)-এর সাথে রোক্বাইয়া (রাঃ)-এর বিবাহ হয়েছিল এবং তার মৃত্যুর পর রাসূল (ছাঃ)-এর অপর কন্যা উম্মে কুলছূম (রাঃ)-এর বিবাহ হয়েছিল।